রণস্থল মাড়োয়ার

শ্রীপারাবত

★ হিন্দুস্থান প্রিণ্টার্স ★

প্রথম প্রকাশ :
অগ্রহায়ণ, ১৩৬১।

প্রকাশক : মুদ্রাকর :
কমল মুখোপাধ্যায়
হিন্দুস্থান প্রিণ্টার্স
৫২বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯।

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা :
সুবোধ গুপ্ত

ব্লক নির্ম্মাতা :
সিটি আর্ট প্রোডাকসন

শ্রীযুক্তা শৈবলিনী দেবী
শ্রদ্ধাস্পদাসু—

লেখকের অন্যান্য উপন্যাস

ঝড় থামবে
আহীর ভৈরোঁ
আমি সিরাজের বেগম
যে জীবন দ.ন
স্বর্ণালী সন্ধ্যা
মমতাজ-দুহিতা জাহানারা
এম এল. পম্পা
মহাপ্রেম
লাডার্স লেন
আমি আজ নায়িকা
শ্যামল দেশে সূর্য ওঠে
কিত্তাগড়
দুর্জয় দুর্গ
বিনোদিনী
আরাবল্লী থেকে আগ্রা
রাজপুত নন্দিনী
রাণাদিল্
সিংহদ্বার
পতঙ্গরূপে শতবায়
বাহাদুর শাহ
জনমে জনমে
নির্জনতা নেই
সেফ ল্যাণ্ডিং
চিত্তোরগড়
হারিয়ে যাবার নেই মানা (কিশোর উপন্যাস)
এরা তিনজন („)
রহস্যময় গিরিকন্দর (প্রকাশের পথে)
দুঃসাহসিক („)

যে
স্বর্ণাল
মমতাজ
এম. এল. এ.
মহাপ্রেম
লাডার্স লেন
আমি আজ নায়িক
শ্যামল দেশে সূর্য ওঠে
কিতাগড়
দুর্জয় দুর্গ
বিনোদিনী
আরাবল্লী থেকে আগ্রা
রাজপুত নন্দিনী
রাণাদিল্
সিংহদ্বার
পতরূপে শতবার
বাহাদুর শাহ
জনমে জনমে
নির্জনতা নেই
সেফ ল্যাণ্ডিং
চিতোরগড়
হারিয়ে যাবার নেই মানা (কিশে
এরা তিনজন (
রহস্যময় গিরিকন্দর (প্রকাশের প
দুঃসাহসিক („)

মাঝখানে আরাবল্লী। ওপারে মেবার। এ'পাশে মাড়োয়ার। রাজধানী যোধপুর সেই কবে থেকে দিল্লীর বাদশাহ আওরঙজেব কবজা করে রেখেছেন। এনায়েৎ খাঁয়ের ওপর মাড়োয়ারের কর্তৃত্ব-ভার। যশোবন্ত সিং-এর পুত্র অজিত সিংকে বীর দুর্গাদাস অনেক বছর আগে বাদশাহের কবল থেকে কৌশলে, শুধু কৌশলে কেন, অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে ছিনিয়ে এনে পর্বতে লুকিয়ে রেখেছেন। মুঘলদের সাধ্য নেই তাঁকে খুঁজে বার করে। অজিত সিং সাবালক হয়ে উঠছেন আবু পাহাড়ের এক গহন অরণ্যে। একজন নকল অজিত সিংকে খাড়া করেছিলেন দিল্লীর বাদশাহ। তাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে নাম দিয়েছিলেন মুহম্মদী রাজ। দিল্লীর হারেমে রেখেছিলেন তাকে। কিন্তু রাঠোরদের চোখে ধুলো দিতে পারেন নি। পরে সেই নকল অজিত সিং-এর মৃত্যুও হলো।

দুর্গাদাস জীবিত অবস্থাতেই হয়ে উঠলেন প্রবাদ পুরুষ। চারণ কবিদের মুখে মুখে তাঁর বীরত্ব-গাথা। পথে-ঘাটে, মরুতে-পর্বতে, সুরের ঝঙ্কার তুলে অহরহ ধ্বনিত হচ্ছে সেই সব গাথা। রাঠোরদের বুকের রক্তে তরঙ্গোচ্ছ্বাস—গর্বের, দেশপ্রেমের! পুত্রদের প্রতি রাঠোর রমণীদের শিক্ষায় সেই একই আদর্শ প্রতিফলিত। ফলে মাড়োয়ার হয়ে উঠেছে শত সহস্র দুর্গাদাসের পবিত্র বিচরণ ক্ষেত্র।

তাদেরই একজন পৃথ্বী সিং। এই পৃথ্বী সিং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কোন পুরুষ নয়। নিজেকে দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করার মত স্বার্থপর সচেতনতাও ছিল তার কল্পনার বাইরে। কিন্তু পাল্লার একদিকে দুর্গাদাস অন্যদিকে পৃথ্বী সিংকে চাপালে হয়ত কোনদিকেই পাল্লা নেমে

যাবে না। কারণ পোষাক পরিচ্ছদের আধিক্য বর্জন করে যেমন পাল্লায় চাপা সমীচীন তেমনি নিজের পদমর্যাদা, অর্থগৌরব, লোকবল ইত্যাদি সব কিছুকে বাদ দিয়েই আসল মানুষটির বিচার।

যোধপুর আর আরাবল্লীর মাঝামাঝি একটি গ্রামে তরুণ পৃথ্বী সিং-এর বাস। যোধপুর থেকে সোজাত, তারপরে নাদোল। সোজাত আর যোধপুরের মাঝামাঝি একটি স্থানে এই গ্রামখানি। গ্রামের অদূরে একটি পাহাড়। পাহাড়ে রয়েছে ঝর্ণা। সেই ঝর্ণা গিয়ে মিশেছে কাছাকাছি বান্দি নদীতে। জায়গাটির কোন গুরুত্ব নেই সামরিক দিক দিয়ে। কারণ এখান থেকে কোন ভাল রাস্তা নেই। যার ফলে মুঘলদের যাতায়াত অকিঞ্চিৎকর। অথচ কিছুটা দূরে সোজা রাস্তায় তাদের চলাচলের বিরাম নেই। তবু এখানকার মানুষ দেশপ্রেমিক। তারা রাঠোর। দুর্গাদাসের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরিত।

এই কাহিনীর পটভূমিকা ইতিহাস ভিত্তিক। ইতিহাসকে এখানে বিকৃত করা হয় নি। নায়ক পৃথ্বী সিং এখানে সেই যুগের সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে ঐতিহাসিক চরিত্র অপেক্ষাও সত্য। স্বাধীনতার জন্য অবিরত সংগ্রাম-রত একটি জাতির তরুণ হয়েও ধর্মের ঊর্ধ্বে মানবতাবোধই তার চরিত্রের মূল ভিত্তি। এমন চরিত্র সেই যুগের রাজপুত আর মুঘলদের মধ্যে মোটেও দুর্লভ ছিল না।

গ্রাম ছেড়ে অনেকটা দূরে এই ছোট্ট ঝরণা! দু পাশে পাহাড়। গাছপালা অনেক। সচরাচর বড় একটা কেউ আসে না এদিকে। তবে জলের এখানে অনেক দাম। বিশেষত যব গম তিল কিংবা মুগের ক্ষেত যখন শুকিয়ে যেতে থাকে তখন গ্রামের লোকেরা দল বেঁধে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে এই ঝরণা থেকে বাঁকে করে জল নিয়ে যায়। নইলে ফসল বাঁচে না। কিন্তু কয়েক বছর সে-সব পাট

নেই। দূরের ক্ষেতগুলো পড়ে রয়েছে অনাবাদী। চাষ করে লাভ নেই। মুঘলদের কবলে যাবে। শক্ত সামর্থ পুরুষ দেখলেও ওদের সন্দেহ। ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার। ওদের ধারণা এইভাবে অত্যাচার চালালে কোন একদিন কারও মুখ থেকে অজিত সিং-এর খোঁজ মিলে যাবে। তবু চাষ যে একেবারে হয় না তা নয়। নইলে বাঁচবে কি করে? কিন্তু তাতে ঝরণার জল বয়ে নেবার প্রয়োজন হয় না। তাই পাহাড়ে ওঠার পায়ে চলার পথ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়েছে। পথের মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে নতুন ঝোপ-ঝাড়।

পৃথ্বী সিং কিন্তু এখানে আসে প্রায় প্রতিদিনই। আজ যেমন এসেছে। এই ঝরনার সঙ্গে তার নাড়ীর টান। একবার দেশে দেখা দিয়েছিল দারুণ দুর্ভিক্ষ। পর পর দুবছর অনাবৃষ্টি। গাঁয়ের জলের উৎস নিঃশেষিত। শুক্‌নো হয়েছিল কূপগুলো। মেয়েরাও সেই বছর এই ঝরণায় আসত জল নিতে। সেই রকম এক দুর্দিনে মেয়েদের সঙ্গে পৃথ্বীর মা দল বেঁধে এসেছিল জল নিতে! কিন্তু ঘরে ফেরার সময় আর একা ফিরে যায় নি। কোলে করে নিয়ে গিয়েছিল নবজাত পৃথ্বীকে! এই ঝরণার ধারে ওই প্রকাণ্ড একখণ্ড চ্যাপ্টা পাথরই হল পৃথ্বীর জন্মস্থান। তাই সে ঝরণার নাম দিয়েছে 'বহ্নি'।

সে বুঝতে পারে 'বহ্নির' কল্‌কল্ কথা। কত কথাই না বলে চলে বহ্নি আপন মনে। তাকে অহরহ শোনায়, আবার স্বমহিমায় যোধপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হবেন যশোবন্ত-পুত্র অজিত সিং। মাড়োয়ার আবার হবে স্বাধীন। বহ্নি মিথ্যা কথা বলে না। কিন্তু একথা বলতে পারে না সে সবাইকে। ভাবালুতাকে পছন্দ করেনা তার জাতি। একমাত্র রূঢ় বাস্তবকেই সত্য বলে মানে তারা। কিন্তু কেন যেন পৃথ্বীর মনে হয়, স্বপ্ন দেখারও প্রয়োজন রয়েছে। দুর্গাদাসের চোখের দিকে চেয়ে সে অনুভব করেছে, সেই চোখ স্বপ্নও দেখতে জানে। স্বপ্ন না দেখলে কল্পনার সৃষ্টি হবে কেমন করে? আর

কল্পনাহীন মানুষ নতুন প্রেরণার অভাবে একই বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খায়।

ঝরণার জলের মধ্যে নেমে পৃথ্বী স্নান করে। গ্রাম থেকে সারাটা পথ সে দৌড়তে দৌড়তে আসে। তারপর কিছুক্ষণ বৈঠক দিয়ে একটু বিশ্রাম করে জলে নেমে পড়ে। এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। তার পোশাক আর অস্ত্র ওই চ্যাপ্টা পাথরের ওপর রেখে দেয়—বাইশ বছর আগে এক গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে যেখানে সে প্রথম পৃথিবীর আলো দেখেছিল!

তার একটি অশ্ব রয়েছে। নাম নন্দিনী। কিন্তু সব সময় ব্যবহার করা যায় না তাকে। দিবালোকে তাকে নিয়ে বার হলে মুঘল সেনাদের নজরে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। অশ্বের ওপরে ওদের বড় লোভ। তাই এই পাহাড়ের পাশে এক পরিত্যক্ত কুটিরে তাকে লুকিয়ে রাখে পৃথ্বী। মাঝে মাঝে রাতের বেলায় সেটির দরকার হয়—যখন দূরের কোন অজ্ঞাত পাহাড় থেকে আদেশ আসে। অশ্ব অনেকেরই রয়েছে, কিন্তু পথেঘাটে সেগুলোর দেখা পাওয়া যায় না।

স্নান করতে করতে চমকে ওঠে পৃথ্বী। একটা পাথর ওপর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে ঝরণার জলের মধ্যে এসে পড়ে। সে ওপর দিকে তাকায়। তারপর জল থেকে উঠে ছুটে গিয়ে পাথরের ওপর থেকে হাতে তুলে নেয় তার তলোয়ার। এই পাহাড়ে বাঘও আছে, ভালুকও আছে। বাঘ মানুষ খায় না বটে, কিন্তু মেজাজী ভালুক প্রায়ই সোজা এসে আক্রমণ করে বসে।

কিছুক্ষণ কাউকে দেখতে না পেয়ে পৃথ্বী পোষাক পরে ফেলে। তারপর আওয়াজ শুনে ওপর দিকে চেয়ে সে হেসে ফেলে। বলে—কিরে ভুলুয়া। জল খাবি নাকি?

একটা ভালুক ছুটতে ছুটতে আসে পৃথ্বীর দিকে। পৃথ্বী তলোয়ার খানা রেখে দিয়ে পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়।

ভালুকটি দৌড়ে এসে তাকে ধাক্কা দেয়।

—এই আস্তে। পড়ে যাব। তোর ধাক্কায় চোট্ পেলে যে আসল কাজই হবে না। কোথায় গিয়েছিলি? মৌচাক পেলি?

ভালুকটিকে আদর করতে থাকে পৃথ্বী। তারপর ঝরণা থেকে আঁজলা ভরে জল নিয়ে তার দিকে ছিটিয়ে দিতেই সে দৌড়ে দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ায়।

—এ কিরে ভুলুয়া। এখনো এত ভয় তোর জলে? সেই কবে বাচ্চা বয়েসে ডুবে গিয়েছিলি, এখনো ভুলিস নি। তোর নাম ভুলুয়া রাখাই ভুল হয়েছে। নাম হওয়া উচিত ছিল মনুয়া।

ভালুকটি আবার এক পা দুপা করে তার দিকে এগিয়ে আসে। পৃথ্বী ওর রকম-রকম দেখে হো হো করে হেসে ওঠে।

সে বলে—ভয় নেই। জল দেবো না। চল্ ওপরে যাই।

ওপর দিকে উঠতে উঠতে সে বলে—হ্যাঁরে ভুলুয়া, সেই তিনবছর আগে জল থেকে তোকে তুলেছিলাম এখনো ভুলিস নি। মানুষ হলে কিন্তু ভুলে বসে থাকত। বলতে পারিস মানুষ এমন কৃতজ্ঞ হয় কি না?

—নিশ্চয় হয়।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পৃথ্বী সিং। ভুলুয়া রাগে ফুঁসতে থাকে। সে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়।

পাহাড়ী পথের পাশে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন একজন সন্ন্যাসী। মুখে তাঁর মৃদু হাসি।

—তোমার ভুলুয়া আমাকে আক্রমণ করবে দেখছি। ওকে সামলাও। নইলে ও-ই মরবে।

ভুলুয়ার ঘাড়ের লোম চেপে ধরে পৃথ্বী প্রশ্ন করে,—কে আপনি?

—সন্ন্যাসী!

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি—বেশ যখন সন্ন্যাসীর। কেন এসেছেন এখানে?

—তোমার ভুলুয়া শান্ত হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—এগিয়ে যেতে পারি ?

—আসুন।

সন্ন্যাসী নেমে এসেই তাড়াতাড়ি ভুলুয়ার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন,—আর ভয় নেই। ও জীবনে আমাকে আক্রমণ করবে না।

—মন্ত্রশক্তি ? পৃথ্বীর প্রশ্নে সামান্য বিদ্রুপের আভাষ।

—যদি বলি হ্যাঁ ?

—তাহলে বলি, এসব ছোট-খাটো ব্যাপারে শক্তির অপচয় না করে দেশের স্বাধীনতার জন্যে সঞ্চিত রাখুন।

—বাঃ, বেশ বলেছ তো ? অন্তত একটু ভাবনা-চিন্তা কর বলে মনে হচ্ছে। তবে আমিও বলি, একজন মানুষের মন্ত্রশক্তিতে দেশোদ্ধারের মত বৃহৎ কাজ সম্ভব নয়। প্রতিটি মানুষের সেই শক্তি অর্জন করা দরকার। আর সেই শক্তি হলো দেশপ্রেম।

পৃথ্বী সিং হালকা হাসি হেসে বলে,—দিল্লীর বাদশাহ বুঝি সেই শক্তিতে বলীয়ান ?

সন্ন্যাসীর চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে,—দিল্লীর বাদশাহকে তুমি স্বচক্ষে দেখেছ কখনো ?

—না।

—আমি দেখেছি। অবাক হয়েছি দেখে। ওঁর অসাধারণ মানসিক শক্তি! তবে তোমাদেরও দুর্গাদাস আছে! পৃথিবীতে ঈশ্বর কোন কোন মানুষকে বিশেষ কোন কাজে পাঠান। সেই সব মানুষের এক এক জনের মনে এক এক রকমের অনুপ্রেরণার আগুন প্রজ্জ্বলিত থাকে। তাঁরা ঈশ্বরের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করতে আসেন। কী সেই উদ্দেশ্য নিজেরাও তাঁরা জানেন না। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে একটা আদর্শ থাকা দরকার।

আমি ওসব গাল-ভরা কথার মানে বুঝি না। আমি সামনের

টুকুই শুধু দেখতে পাই।

—জানি। তাই তোমাকে প্রথমেই বলেছিলাম, মানুষ যদি প্রকৃত মানুষ হয় তাহলে তার মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধ থাকে।

—আমার প্রশ্ন হলো, প্রকৃত মানুষ কয়জন ?

সন্ন্যাসী হেসে বলেন,—তুমি তো মাত্র সামনেরটুকু দেখতে পাও বলছিলে। আমি আরও অনেকটা বেশী দেখি। তোমাকে তাই বলে রাখি, খুব শিগগির তোমার জীবনে একজন মানুষের সাক্ষাৎ মিলবে যে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার জন্যে তোমাকে প্রাণ হারাতে হবে না।

—কি সব বলছেন ?

—আমি মিথ্যা বলিনা। সে তোমার শত্রু—ঘোরতম শত্রু। জীবনে তার সঙ্গে তোমার কয়েকবার দেখা হবে।

অবিশ্বাসের হাসি হেসে পৃথ্বী বলে,—শেষবারে আমাকে নিশ্চয় সে মেরে ফেলবে ?

গম্ভীরস্বরে সন্ন্যাসী বলেন—আমি নীচে গিয়ে উপাসনা করব। তুমি এখন আসতে পার। পরে দেখা হবে।

পৃথ্বী সিং ভুলুয়াকে নিয়ে ওপরে উঠে যায়। একটু পরেই সূর্য ডুববে। একবার নন্দিনীকে গিয়ে দেখে আসতে হবে। সারাদিন সে খুর ঠুকে ঠুকে কুটিরের মেঝেতে গর্ত করে ফেলেছে। কী অস্থির ! চুপচাপ থাকতেই পারে না। সব সময় পৃথ্বীকে পিঠে নিয়ে ছুটতে চায়।

—যা ভুলুয়া।

সঙ্গে সঙ্গে ভালুকটি বোঁ করে ঘুরে ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হয়ে যায় বনের মধ্যে।

সন্ন্যাসীর কথা চলতে চলতে ভাবে পৃথ্বী। মানুষটির চেহারা দেখলে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কথার মধ্যে কেমন একটা দম্ভ। ভবিষ্যৎকে যেন চোখের সামনে দেখতে পায় ! এমন মানুষ আছে

নাকি পৃথিবীতে ? এটা তো সত্যযুগ নয়।

সূর্য যোধপুরকে বাঁয়ের দিকে ফেলে অস্ত যায়। পৃথ্বী সিং কুটিরের সামনে এসে উপস্থিত হয়। তার উপস্থিতি রোজই কীভাবে যেন টের পায় নন্দিনী। ডেকে ওঠে অসহিষ্ণুভাবে। কোন মুঘল সেনা এপথ দিয়ে যায় না। গেলে, ওই ডাক শুনে ধরে নিয়ে যেত। এমন ফাঁকা কুঁড়ে ঘর মাড়োয়ারে অনেক দেখা যায় আজকাল। বাসিন্দারা পালিয়েছে পর্বতে। তাদের গ্রামখানাই সবচেয়ে বেশী পরিত্যক্ত। কবে কোন ঘরে মুঘলরা আগুন লাগাবে ঠিক নেই। অজিত সিংকে পাবার জন্য ওরা মরিয়া। ওদের বাদশাহের সম্মান নির্ভর করছে এর ওপর। বাদশাহ স্বয়ং তাই দাক্ষিণাত্য ছেড়ে আজমীঢ়ে এসে শিবির স্থাপন করেছেন। চিতোরে রেখেছেন এক পুত্র আজিমকে। আর মাড়োয়ারের ভার সম্প্রতি দিয়েছেন সব চাইতে প্রিয় পুত্র আকবরের ওপর। মা-মরা পুত্র আকবরকে নাকি তিনি শৈশব থেকে নিজের মনের মতো করে মানুষ করেছেন।

—নন্দিনী।

অশ্ব-তনয়া ডেকে ওঠে।

দরজা খুলে পৃথ্বী নন্দিনীকে বাইরে বার করে। আজকে নন্দিনীকে নিয়ে বাইরে যাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বেচারির মুখের দিকে চেয়ে মন টলে যায়।

—ঘরের ভেতরটা একেবারে নরককুণ্ড করে রেখেছিস্ হতভাগী। দাঁড়া আগে পরিষ্কার করি। জলের পাত্র উল্টে দিলি কিভাবে ? ঠিক আছে, ভিস্তি করে তোর পিঠেই জল বয়ে আনব। একটু সভ্য হয়ে থাকতে শেখ। তুই না মেয়ে ? ভুলুয়া ছেলে হয়েও কত সভ্য জানিস ? ওর মুখের লোমে মাঝে মাঝে শুধু আট-দশটা মৌমাছি আটকে থাকে। ওকে কামড়াতে না পেরে আমাকে কামড়ে দেয়।

—চিঁ-হি-হি-হি—

—ঠিক আছে বাবা। তুই খুব সভ্য।

সব ঠিকঠাক করে নন্দিনীকে নিয়ে সে যখন রওনা হয় তখন চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। ছেলেবেলায় এই সময় সে দেখতে পেত কত কুটিরের প্রদীপের আলো দূর থেকে চোখে পড়ত। এখন অনেক কুটিরই জনশূন্য। এখন কদাচিৎ দেখা যায় দূরের পাহাড়ের দাবানল। অথবা কখনো দেখা যায় রাতের নির্মল আকাশের কোন একদিক সহসা রক্তিম হয়ে উঠেছে। বুঝতে অসুবিধা হয়না কোন গ্রামের ঘর পুড়ছে। সেই সঙ্গে কিছু রক্তপাতও। প্রতিরোধ যেখানে প্রবল, রক্তপাত সেখানে অবশ্যম্ভাবী।

যোধপুর থেকে একশোজনের একদল মুঘল অশ্বারোহী দলপতি করিমবক্সের নেতৃত্বাধীনে এগিয়ে যাচ্ছিল দক্ষিণে ঝালোরের দিকে। তাদের গন্তব্যস্থল ঝালোর নয় যদিও। যোধপুরে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। ক্ষেতে ফসল নেই। চাষবাস বন্ধ। অথচ আজমীঢ় কিংবা দক্ষিণে চিতোর থেকে যে সমস্ত খাদ্যসম্ভার পাঠানো হয় সেগুলো রাঠোররা লুঠ করে নেয়। প্রথমে ফৌজদার অতটা গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু এখন তার টনক নড়েছে। সে জানতে পেরেছে পরিকল্পিত-ভাবেই এই সব আক্রমণ চালানো হচ্ছে এবং এর পেছনে রয়েছেন স্বয়ং দুর্গাদাস।

করিমবক্স এগিয়ে চলেছে দুর্গম গিরিসঙ্কটের পাশ ঘেঁষে। উদ্দেশ্য হলো, যে সমস্ত মুঘল চৌকি রয়েছে, সেগুলো পর্যবেক্ষণ করা। খবর এসেছে সেই সমস্ত চৌকির অনেকগুলোর অস্তিত্বই নেই। দুর্গাদাসের দল আচমকা ঝটিকা আক্রমণে কোথাও এদের ধ্বংস করেছে কোথাও পশ্চাদ্ধাবন করে তাড়িয়ে দিয়েছে। করিমবক্সের লক্ষ্য যোধপুর থেকে ঝালোরের পথের মাঝামাঝি একটি দুর্গ। সেই দুর্গে পৌঁছে, সেখান থেকে আবার যোধপুর প্রত্যাবর্তন।

রাত শেষ না হতেই রওনা হয়েছিল তারা। সূর্য যখন মধ্য গগনে তখন একটি খাড়া পাহাড়ের সরু রাস্তা ধরে তারা এগিয়ে

চলেছে। অশ্বারোহীদের সবার মনে অস্বস্তি। তারা ভালভাবে জানে, এই পাহাড়ী রাস্তার মারাত্মক বাঁকে দুর্গাদাসের দল ওৎ পেতে থাকে। তাদের আচমকা আক্রমণে কত অশ্বারোহী ঘোড়া নিয়ে গভীর খাদের মধ্যে চিরতরে অদৃশ্য হয়েছে। তাই তাদের বুকে মৃদু কম্পন। কিন্তু করিমবক্স নির্ভয়। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এই তরুণ। তাছাড়া জীবন ও মৃত্যুর মাঝে যে বিরাট ব্যবধান কল্পনা করে সাধারণ মানুষ মৃত্যুকে বিভীষিকা বলে ভাবে, করিমবক্সের মানসিক অবস্থা তেমন হবার সুযোগ পায় নি। তার মনে উচ্চাশা রয়েছে যথেষ্ট, কিন্তু উচ্চাশার মধ্যে কোন উন্মাদনা নেই—যে উন্মাদনা মানুষকে কুটিল করে, নীচ হতে প্রবৃত্ত করে। সে বিশ্বস্ত মুঘল, সে অসাধারণ যোদ্ধা, অসি চালনায় তার জুড়ি মেলা খুব সহজ নয়। তবু তার মুখের দিকে চাইলেই বোঝা যায় একটা নির্বিকারত্ব মুখখানির ওপর ছায়া ফেলেছে। শৈশবে তার মুখ দেখতে খুবই মিষ্টি ছিল। কিন্তু এখন সেই মিষ্টত্বের বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই। এমনকি প্রখর সূর্য-তাপেও সেই মুখ রক্তিম হয়ে ওঠে না। এই বলিষ্ঠ চেহারায় অমন অপেক্ষাকৃত ফ্যাকাশে মুখ বড় একটা চোখে পড়ে না। ওর দলের লোকেরা আড়ালে বলাবলি করে, জ্যান্ত মানুষের দেহে মৃত নবাবের মুখ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। নবাবের মুখ এই জন্যেই বলে, কারণ করিমবক্সের মুখের গড়ন প্রায় নিখুঁত। তবু সেখানে যেন প্রাণ-স্পন্দনের অভাব। কিন্তু সারা মুখে তার চোখ-দুটি ব্যতিক্রম। সেই চোখে তীব্রতা আছে, সেই চাহনিতে রয়েছে গভীরতা। তার এই পঁচিশ বছরের জীবনের মধ্যেই একটা বড় রকমের আঘাত তাকে এমন করেছে।

আরও একটু এগিয়ে গেলেই পাহাড় শেষ। তারপর ছোট্ট একটি নদী। দূরের কোন পাহাড়ের ঝরণার জল এই নদীর সৃষ্টি করেছে। নদীতে জল নেই বিশেষ, কিন্তু গভীর খাদ। অতীতে কোন একসময় হয়ত এটি জলপূর্ণ থাকত। তখন রাজস্থান এমন মরুময় ছিল

কিনা কে জানে।

এই নদী পার হতে গিয়ে বহুবার মুঘলরা আক্রান্ত হয়েছে। তাই করিমবক্স ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে তার দলের লোকদের প্রস্তুত হতে আদেশ দেয়। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যেতে না যেতেই ওপর থেকে বড় বড় পাথর গড়িয়ে পড়তে থাকে। অশ্বারোহীরা ভীত বিহ্বল। করিমবক্স কণ্ঠস্বরকে উচ্চগ্রামে তুলে তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে বলে। কিছুদূর ছুটে পেছনে অশ্বপদশব্দ না শুনতে পেয়ে ফিরে দেখে একজনও অনুসরণ করেনি তাকে। সে নিঃসঙ্গ। জীবনে এই প্রথম এমন অপমানজনক পরিস্থিতিতে পড়তে হলো তাকে। এই সম্পূর্ণ অপরিচিত দলের নেতৃত্ব নিতে গোড়া থেকেই তার সায় ছিল না। অথচ এনায়েৎ খাঁয়ের কড়া হুকুম। না মেনে উপায়ও ছিল না কোন। এই দলটি কিছুদিন আগে আজমীঢ় থেকে এসেছিল। একেবারে সুনাম নেই এদের। এদের প্রথম দলপতি এই রকমই কোন এক ঘটনায় নিহত হয় নাদোলে। আজ সম্ভবত তার পালা।

অশ্বটিকে কিছুক্ষণ দাঁড় করায় করিমবক্স। পাহাড়ের ওপরে শত্রু। সামনের দিকে এগিয়ে গেলেও নিশ্চয় শত্রুর মুখে পড়তে হবে। কারণ দলটিকে বিচ্ছিন্ন করে একে একে সবাইকে তারা নিশ্চিহ্ন করতে চায়। ওপর থেকে এখনো পাথর পড়ে চলেছে। তাকে পেছনে যেতেই হবে। দলের কাউকে তখন হয়ত আর পাওয়া যাবে না। তবু ফিরতে হবে তাকে।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সে ছোটে। একটু গিয়েই দেখে তার দলের পাঁচ ছয় জন লোক আহত অবস্থায় তারস্বরে চিৎকার করছে। দুটো ঘোড়াও আহত হয়ে পড়েছে। একটু অনুকম্পা হয় তার। কিন্তু থামার উপায় নেই। সে ছুটে চলে। হঠাৎ তার অশ্ব অস্বাভাবিক একটা লাফ দেয়। মনে হয় পায়ে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সে ছিটকে পড়ে পাহাড়ের গায়ে। বাঁ পায়ে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে। তাড়াতাড়ি একটা গাছের শিকড় ধরে ফেলে সে। নইলে

গড়িয়ে যেত অনেক নীচে।

শত্রুপক্ষের হৈ-চৈ করিমবক্সের কানে আসে। সে খুব সাবধানে পাহাড়ের গা বেয়ে পাথরের ফাটলে পা রেখে আর গাছের ডালপালা ধরে নামতে থাকে। অনেক নীচে একটা রাস্তা দেখা যাচ্ছে। ঐ রাস্তা ধরেই তারা ওপরে উঠেছে। কিন্তু পাহাড় খাড়া। হাত ফস্‌কে গেলে উপায় নেই। এরই মধ্যে সে ভাবতে চেষ্টা করে তার ঘোড়া ওভাবে লাফিয়ে উঠল কেন? সে কি আহত হয়েছে? কোথায় চোট্ পেল? দেহে না পায়ে?

কোমরে হাত দিয়ে করিমবক্স দেখে তার তলোয়ার অক্ষতই আছে। ছিটকে পড়ে গেলেও সেটি অশ্বারোহীদের মত তাকে ফেলে পালায় নি। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয় সে। আত্মরক্ষার জন্য এটির প্রয়োজন হতে পারে। বাঁ পা বড় বেশী টন্ টন্ করছে। হাড় ভাঙল কিনা কে জানে।

ধীরে ধীরে নীচে নামতে যথেষ্ট পরিশ্রম। দৈবাৎ হাত ফসকে যাবার সম্ভাবনা যখন-তখন। তাছাড়া শত্রুপক্ষের দৃষ্টিগোচর হবার আশঙ্কা রয়েছে। তবু এরই মধ্যে অজ্ঞাতে তার মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে ওঠে। এই ধরণের না হলেও বিপদ তার জীবনে নতুন কিছু নয়। কিন্তু অদূর অতীতেও বিপদের মধ্যে একটা রোমাঞ্চ থাকত। তার চোখের সামনে ভেসে উঠত একটি মেয়ের মুখ। আর তখনি সে বাড়তি প্রেরণা পেত, বাঁচতেই হবে তাকে ফতেমার জন্যে। নইলে ফতেমার বুক ভেঙে যাবে। কথাটা ভেবে একটু জোরেই হেসে ওঠে করিমবক্স। সেই ফতেমার বিশ্বস্ততা, তার প্রেম, এক বছরের অদর্শনেই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল। আজমীঢ় থেকে দিল্লী ফিরে গিয়ে দেখতে পেল সে, ফতেমা এক আমীর-পুত্রের বেগম হয়ে তার ঘর আলো করে রয়েছে। অথচ কথা দিয়েছিল সে। বলেছিল আর কারও সঙ্গে সাদীর কথা কল্পনাও করতে পারে না সে। করিমবক্স ভাবে তারই ভুল হয়েছিল। নিজের মাকে জেনেও সেই

মাতৃজাতির আর একজনকে বিশ্বাস করা তার অজ্ঞতা আর অদূরদর্শিতার ফল। তার বাবা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেয় নি, একথা এখন আর দিল্লীর কারও অজানা নয়। যে হত্যা করেছিল তার বাবাকে, মা এখন তারই ঘর করছে। মা চেয়েছিল ঐশ্বর্য—পেয়েছে, যথেষ্ট পেয়েছে। বাবার অত ঐশ্বর্য ছিল না। ফতেমাও তাই চেয়েছে। সে তৃপ্তি পাক। কিন্তু তাই বলে মা তার আপন গর্ভের সন্তানকে ওভাবে যন্ত্রণা দিত কেন? মা কি তাকেও হত্যা করতে চেয়েছিল? এ প্রশ্নের জবাব করিমবক্স আজও পায় নি। মা তাকে পরিত্যাগ করে নতুন স্বামীর ঘরে গিয়েছিল। তারপর মা আবার নতুন করে মা হলো। সে অবাক হয়ে দূর থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছে, সেই সন্তানকে মা কেমন আদর করছে। কত দরদ সেই সন্তানের ওপর। যখন বুঝতো না, তখন কতবার মাকে দেখার জন্য ছুটে ছুটে গিয়েছে এই অট্টালিকার প্রধান ফটকের কাছে। তারপর সঙ্কোচে আচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। মায়ের নতুন স্বামী সম্ভবত অনুকম্পাবশত তাকে নিয়ে গিয়েছে ভেতরে। তখনো কী সাংঘাতিক ব্যবহার। ভয়ে ভয়ে পালিয়ে আসত করিমবক্স।

রাস্তার একেবারে কাছে নেমে আসে সে। হাত প্রায় অবশ হয়ে এসেছে ব্যথায়। এতটা পথ ঝুলতে ঝুলতে নামা, বলতে গেলে অসম্ভব। গায়ে অনেক জায়গায় আঁচড় লেগেছে। পায়ের ব্যথা বেড়েছে। ঘোড়াটা থাকলে বেশ হতো। বছর দু-এর সাথী ছিল এটি। সুন্দর, ক্ষিপ্রগতি। মনের কথা বুঝতে পারত।

রাস্তায় নেমে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে সে। বাঁ-পা বেশ ফুলেছে। দুপাশে দেখে কেউ কোথাও নেই। এভাবে কতদূর যাবে সে? গায়ে তার মুঘল সেনার পরিচ্ছদ। কোন্ গ্রামে আশ্রয় মিলবে? এ-দেশে একজন বিশ্বাসঘাতক মানুষের সন্ধান পাওয়া বড়ই কঠিন।

পেছনে কোন অশ্বারোহী আসছে। শব্দ শোনা যায়। করিমবক্স একটি পিপুল গাছের আড়ালে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ে। অশ্বারোহী

আরও এগিয়ে আসছে। তারই দলের কেউ কি? একবার ভাবে, উঁকি দিয়ে দেখবে। কিন্তু সেভাবে দেখাটা নিরাপদ নাও হতে পারে। সে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। অশ্বারোহী আসতে আসতে পিপুল গাছের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে। বিস্মিত হয় করিমবক্স। তাকে দেখতে পেয়েছে নাকি?

অশ্বারোহীর শান্ত কণ্ঠস্বর শোনা যায়—সামনে এসো। আমি তোমাকে দেখেছি।

মুঘল নয়। একক কোন রাজপুত। পেছনে ওর দলের আর কেউ আসছে নাকি? যদি না আসে তাহলে ওর সম্মুখীন হওয়া যেতে পারে। পরাস্ত করা এমন কিছু অসুবিধা হবে না। তবে মাটিতে দাঁড়িয়ে লড়তে হবে। তার ওপর পায়ে চোট আছে।

—সামনে এসো। আমি একা। মুঘলরা কি একজন মানুষের সামনে আসতেও ভয় পায়?

করিমবক্স আড়াল থেকে সামনে এসে বলে,—তোমার অশ্ব রয়েছে।

—বেশ তো। অশ্ব থেকে নামছি।

করিমবক্স দেখে রাজপুতটি বয়সে নবীন। তার চেয়েও তিন চার বছরের ছোট হবে। মুখের কমনীয়তা এখনো একেবারে অদৃশ্য হয়নি। কিন্তু উচ্চতায় তার মাথা ছাড়িয়ে যায়। চেহারা বলিষ্ঠ।

রাজপুত এক লাফে মাটিতে নামে। হাতে কোষমুক্ত অসি। বলে,—তুমি কি যুদ্ধ করতে চাও?

—তবে কি ভাবছ, এমনিতে প্রাণটা দেব?

—ইচ্ছে করলে বন্দী হতে পার।

—রাজপুতের কাছে? ইজ্জত নেই আমার? তাছাড়া বন্দী তোমাকেও করতে পারি।

রাজপুত হেসে বলে,—বন্দী করে কোথায় নিয়ে যাবে? তোমাকে সাহায্য করার জন্য একজন মুঘলও নেই। যারা বেঁচেছিল সব

পালিয়েছে।

করিমবক্স ভাবে, এই রাজপুতকে আহত কিংবা নিহত করা তার পক্ষে খুব একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। কারণ অসিযুদ্ধে তার দক্ষতা অসীম। তবে তার পায়ের আঘাত তার ক্ষিপ্রতাকে কিছুটা কমিয়ে দেবে। কিন্তু তাতেও খুব এসে যাবে না। আর একে নিষ্ক্রিয় করতে পারলে অশ্বটি পাওয়া যাবে। যোধপুরে ফিরে যেতে তখন ততটা অসুবিধা হবে না। রাজপুতটি হয়ত ঈশ্বর প্রেরিত। তিনি চাননা করিমবক্স নামে মুঘল সেনানায়ক এত তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে বিদায় নিক। এই আকর্ষণ-হীন ধরিত্রীতে আরও পদোন্নতি বোধহয় তার প্রাপ্য। তাতে জীবনে সুখ আসবে না বটে, কিন্তু তৃপ্তি মিলবে।

সে রাজপুতকে বলে,—কথায় কাজ কি? অসি চালাতে শিখেছ?

তেমনি নির্বিকার কণ্ঠে রাজপুত বলে,—শিখেছি।

করিমবক্স তাকে আক্রমণ করে। একটু পরেই করিমবক্স অনুভব করে, তাকে আত্মরক্ষা করতে হচ্ছে। সে অনায়াস ভঙ্গিতে রাজপুতের আক্রমণ কাটায় কয়েকবার। তারপর বুঝতে পারে বয়সে তরুণ হয়েও অস্ত্র বিদ্যায় খুবই পারদর্শী রাজপুতটি। কোন কৌশলেই তাকে আয়ত্বে আনা সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে পায়ের আঘাত তাকে রীতিমত অসুবিধায় ফেলছে।

রাজপুত হঠাৎ পেছিয়ে গিয়ে বলে,—তুমি ত দেখছি আহত। তোমার পায়ে কিছু হয়েছে। তোমার সঙ্গে লড়ে কি লাভ?

করিমবক্স অপমানে গরম হয়ে ওঠে। সে ছুটে গিয়ে আক্রমণ করে। কিন্তু একটু পরেই তার শ্লথ গতির জন্য হাতের অসি ভেঙ্গে যায়। হাতলটি শুধু হাতের মুঠোয় ধরা থাকে। সে অপেক্ষা করে মৃত্যুর জন্য। তার সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত।

রাজপুত বলে,—এবারে চল।

—কেন? এখানেই তো বধ করতে পার আমাকে। অসুবিধা

কোথায় ?

— নিরস্ত্রকে ?

করিমবক্স থমকে যায়। তারপর বলে, — তবে কি বন্দী করতে চাও আমাকে ?

— আপাতত তাই। কিন্তু তুমি চলবে কি করে ?

— আমি কোথাও যেতে চাই না। বন্দী হওয়া আমার কাম্য নয়।

— তুমি ভীষণ সাহসী। কী সুন্দর অসিবিদ্যা জান। তোমার পায়ে আঘাত না থাকলে অনেকক্ষণ লড়া যেত। আমার খুব আনন্দ হত।

— শোন রাজপুত। আমাকে বন্দী করার চেষ্টা করো না। আমি পছন্দ করি না। তোমাদের দিন শেষ হয়ে আসছে। তোমাদের দুর্গাদাস খুব বেশী দিন বেঁচে থাকতে পারবে না। তুমিও নও। মাড়োয়ারের যেসমস্ত মূর্খ দুর্গাদাসের সঙ্গে এতদিন একজোট হয়েছে তারা সবাই মরবে। সুতরাং আমাকে যেতে দাও।

রাজপুতটি হেসে বলে, — অত ভবিষ্যৎ-বাণীতে কাজ কি ? পরে কি হবে সে কথা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই। আমি সামনের টুকু শুধু দেখতে পাই। আমি দেখছি তোমাকে ছেড়ে দিলে তোমার মৃত্যু অবধারিত। তোমার এই পোষাক রাজপুতদের মনে আগুন ধরাবে। তারা দেখতে যাবে না, তুমি নিরস্ত্র কিনা। তাই আপাতত আমার সঙ্গে চল।

— আমি বন্দী ?

— এই মুহূর্তে তো তাই। তোমার পায়ের অবস্থা খুব খারাপ দেখছি। যাবে কি করে ? এক কাজ করো। আমার নন্দিনীতে তুমি ওঠো।

করিমবক্স খুবই বিস্মিত হয়। তরুণটিকে সৃষ্টিছাড়া বলে মনে হয় তার কাছে। আজ যদি তরুণটি পরাস্ত হতো তাহলে তাকে হত্যা করতে এক মুহূর্তও দ্বিধা করত না সে।

সে বলে – কিন্তু তুমি! তুমি কীভাবে যাবে?

– আমি ঘোড়ার রাশ হাতে নিয়ে তোমার আগে আগে চলব।

– এত যত্নে আমাকে নিয়ে চলেছ দুর্গাদাসের হাতে সমর্পণের জন্য তো?

– তাড়াতাড়ি উঠে পড়। মাড়োয়ারের আর কেউ দেখলে তোমাকে বাঁচতে দেবে না।

করিমবক্স কৌতূহল নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে। এই প্রথম তরুণটির জন্য তার হৃদয়ে একটু সহানুভূতির উদ্রেক হল।

সে বলে – তোমার এই অশ্বটি চমৎকার। কি নাম বললে? নন্দিনী?

– হ্যাঁ। ভাল না?

– খুব ভাল। তবে আমরা অন্য ধরণের নাম রাখি।

– জানি। তোমরা যে মুঘল।

– তোমার নাম কি?

– পৃথ্বী সিং। তোমার?

– করিমবক্স।

– তুমি অসাধারণ যোদ্ধা। যেভাবে কয়েকবার কাটালে, আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। শুধু অনুশীলনে এতটা হয়না। তুমি জাত যোদ্ধা।

করিমবক্স মনে মনে বলে, তুমিও তাই। পায়ে চোট না থাকলেও খুব বেশী সুবিধা হতো না। কারণ অন্য সব বিষয়ে সমান সমান হলেও রাজপুতটির উচ্চতা আর বলিষ্ঠতা তার চেয়ে বেশী।

– তুমি কি করে বুঝলে আমি পিপুল গাছের আড়ালে আছি?

– তুমি ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ার পর থেকেই আমি নজর রেখেছি। তুমি নেমেছ পাহাড় বেয়ে, আমি অন্য পথে এসেছি। পিপুল গাছটি ছাড়া আশেপাশে আর কোন বড় গাছ নেই। তাছাড়া নন্দিনী ওখানে গিয়েই থেমে পড়ল। ও সব বুঝতে পারে।

—তোমরা বন্দীদের নিয়ে গিয়ে কি কর ?

—বন্দী বড় একটা কেউ হয় না। এখন আমাদের নিজেদেরই থাকার জায়গা নেই।

—আমাকে নিয়ে গিয়ে কি করবে ?

পৃথ্বী সিং কোন জবাব দেয় না। তাকে চিন্তিত দেখায়। মনে হয়, এই মুহূর্তে সে-ও জানে না করিমবক্সকে নিয়ে গিয়ে কি করবে।

চলতে চলতে পৃথ্বী গুন্‌গুন্ করে গান গাইতে শুরু করে। এই পাহাড়ী পথে চলতে তাকে এতটুকু পরিশ্রান্ত বলে মনে হয় না। গান গাইবার মত অজস্র গাথা রয়েছে—চারণ কবি রচিত। পৃথ্বী সিং গাইছিল দুর্গাদাসকে নিয়ে রচিত গাথা।

করিমবক্স চুপচাপ শোনে। কারণ গুন্‌গুন্ করতে করতে পৃথ্বী জোরে জোরেই এক সময় গাইতে শুরু করেছিল।

করিমবক্সের মনে জ্বালা ধরে। সে বলে ওঠে,—তোমার গলা খাসা। কিন্তু দুর্গাদাসকে নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করছ।

—তুমি আমাদের মনোভাব কি করে বুঝবে ?

—তোমাদের এই বাড়াবাড়ি দুর্গাদাসের দম্ভ আকাশচুম্বী করে তুলবে। ফলে অজিত সিং আর মাড়োয়ারের অধিপতি হতে পারবে না কোনদিনও। দুর্গাদাসই সিংহাসন দখল করবে। তারপর তার ছেলে।

পৃথ্বী সিং থেমে পড়ে। তীব্র দৃষ্টিতে করিমবক্সের দিকে চায়। তারপর ধীরে ধীরে সংযত কণ্ঠে বলে—মুঘলদের ব্যাপার-স্যাপার আমরা বুঝিনা। তোমরা হলে হয়ত তাই করতে। কিন্তু রাজ-পুতদের তুমি দেখছি চিনতে পারো নি। যদি চিনতে, তাহলে আজ দলবল নিয়ে এই অসহায় অবস্থায় তোমাকে পড়তে হতো না।

জ্বলে ওঠে করিমবক্স। বলে—যুদ্ধের সঙ্গে তোমাদের চিনতে না পারার সম্পর্ক কোথায় ?

—আছে বৈকি। দুর্গাদাস তোমাদের নিজের হাতের পাঁচ

আঙ্গুলের মত চেনেন। যার ফলে সামান্য সামর্থ্য নিয়েও তোমাদের নাজেহাল করে ছাড়ছেন। শেষ পর্যন্ত তোমরাই পরাস্ত হবে।

করিমবক্স হেসে ওঠে। সেই হাসি অট্টহাসি না হলেও তাতে যথেষ্ট ধার ছিল। সে বলে—তোমাদের দুর্গাদাসের দিন শেষ হয়ে আসছে।

—দেখা যাক।

অনেকটা পথ অতিক্রম করে পৃথ্বী সিং তাদের গ্রামের প্রান্তে এসে হাজির হয়। আর কিছুটা অগ্রসর হয়ে সে একটি কুটিরের সামনে আসে। কুটিরটি তাদের গ্রামের ঠিক বাইরে। এটিও পরিত্যক্ত। এর মালিক সুজয় সিং গতবছর শিবানার কাছে এক যুদ্ধে নিহত হলে, তার বিধবা পত্নী একমাত্র কন্যাকে গিয়ে পিতৃগৃহে চলে গিয়েছে। এখন এটি পৃথ্বী সিং প্রায়ই রাতের বেলায় ব্যবহার করে। কখনো গ্রামের অন্য যুবক যারা উপস্থিত থাকে মাঝে মাঝে তারাও এসে জোটে। এখানে বসে অনেক আলোচনা হয়, অনেক পরিকল্পনার সূতিকাগার এটি। তাছাড়া তাদের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রও বটে। এখন অমর সিং ছাড়া গ্রামের অন্যান্য যুবকেরা অনুপস্থিত।

কুটিরের সামনে পৃথ্বীর কথামত করিমবক্স নন্দিনীর পৃষ্ঠদেশ থেকে অবতরণ করতে গিয়ে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে। সে বুঝতে পারে তার শরীরের উত্তাপ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশ শীত করছে।

পৃথ্বী সিং তার মুখের দিকে চেয়ে বলে—তোমার পায়ে ব্যথা জানি। কিন্তু মুখের চেহারা এমন কেন? কি হয়েছে?

—কিছু না। এবারে কি করবে আমাকে নিয়ে?

—এই কুটিরে আমি রাতের বেলায় এসে থাকি মাঝে মাঝে। শয্যা বলতে খড়ের গাদা। তোমাকে এখানেই থাকতে হবে কষ্ট করে। এর চেয়ে আরামের ব্যবস্থা করা আমার অসাধ্য।

করিমবক্স কোনরকমে ঘরের ভেতরে ঢুকে যায়। সে পাদুকা খুলে ফেলে। এখন শুধু একটু বিশ্রাম চায়। চারদিকে একবার চেয়ে

দেখে নেয় ঘরখানি কতটা মজবুত। কারণ বাইরে থেকে নিশ্চয় দরজা বন্ধ করে দেবে পৃথ্বী সিং।

পৃথ্বী সিং ওর মনোভাব বুঝতে পারে। বলে—দরজা তুমিই বন্ধ করে দিও ভেতর থেকে। তোমার বাইরে যাবার প্রয়োজন হতে পারে। দরজা খুলে রেখোনা। রাতে মাঝে মাঝে ভালুক আসে। আর পালাবার চেষ্টা করে খুব লাভ নেই। একটিও ঘোড়া জুটবে না সারা গাঁয়ে। আমারটি অনেক দূরে রাখি।

আর কিছু শোনার ইচ্ছা হয় না করিমবক্সের। সে খড়ের গাদার ওপর বসে পড়ে।

—তুমি দরজা বন্ধ করে দাও করিমবক্স। আমি তোমার জন্যে খাবার জোগাড় করতে চললাম।

—খাবার আনো আর না আনো, একটু পানি দিও যদি পারো।

পৃথ্বী সিং দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গ্রামের পথ ধরে। নন্দিনীকে বলে—তোর বড় পরিশ্রম গেল আজ। চল্ আগে তোকে রেখে আসি। কালকের জল আর দানা মজুত আছে। খেয়ে-দেয়ে প্রস্তুত থাকবি। যখন-তখন দরকার হতে পারে। করিমবক্স খুব জবরদস্ত লোক কিন্তু। ওর দলের যারা পালিয়েছে, তারা যোধপুরে পৌঁছোলে, মুঘলরা চুপচাপ বসে থাকবে না।

নন্দিনী ঘোঁৎ করে অদ্ভুত শব্দ করে। শুনে মনে হয় পৃথ্বীর এইসব আদিখ্যেতা তার ভাল লাগছে না।

দূর থেকে নন্দিনীর কুটিরের দিকে চেয়ে পৃথ্বীর ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে ওঠে। চারিদিকে ভালরকম অন্ধকার হয়ে এসেছে। সেই অন্ধকারে কুটিরের সামনে কে যেন আগুন জ্বালিয়েছে। ওখানে কে আসতে পারে? পরাজিত মুঘলদের কেউ কি? ছিটকে এসে ওখানে আশ্রয় নিয়েছে? তাহলে অমন প্রকাশ্যে আগুনই বা জ্বালাবে কেন? পৃথ্বী চিন্তিত হয়। সাবধানে এগোতে থাকে সে।

নন্দিনীকে একটু দূরে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে সে কুটিরের দিকে যায়। ঘরের দাওয়ার ওপর আগুন জ্বালিয়ে কেউ নিশ্চিন্তে চাপাটি তৈরী করছে। আঁধার হয়ে আসায় বুঝতে পারা যায় না সে মুঘল কিনা। আরও হুঁশিয়ার হয়ে সে এগিয়ে যায়।

সেই সন্ন্যাসী। মাত্র কয়েকদিন আগে ঝরণার পারে দেখেছিল যাকে। একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ায় পৃথ্বী।

সন্ন্যাসী বলেন – তোমার ভুলুয়া কোথায় ?

– সে থাকে পাহাড়ে। আপনি এখানে কেন ?

– অসুবিধা আছে ?

– এই ঘরে আমার অশ্বটি থাকে।

– সে তো দেখতেই পেলাম। তাই বাইরে এসে বসেছি। ঘরের ভেতরে যা করে রেখেছে। ঘোড়াটি কোথায় রেখে এলে ?

– নিয়ে আসছি।

নন্দিনীকে নিয়ে ফিরে তাকে ঘরের ভেতরে রেখে বাইরে এসে সন্ন্যাসীকে বলে – আপনি শোবেন কোথায় ?

– শুলে, এখানেই শুয়ে পড়ব।

– ভালুক আসতে পারে। ভুলুয়া ছাড়া আরও ভালুক আছে। সবার গায়ে আপনি হাত বুলিয়ে দেন নি।

– আসুক। আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। বসো।

– আজকে বসতে পারব না। আপনি থাকবেন এখানে ?

– বলতে পারি না। বসো, একটু গল্প-সল্প করি। তোমার জন্যেও কয়েকটা চাপাটি বানিয়ে ফেলি।

– না। আমাকে বাড়ি ফিরতে হবে। আমি একা খেলে চলবে না। আর একজনের জন্যেও কিছু খাবার নিতে হবে।

– কার জন্যে খাবার নিতে হবে ?

– একজন বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সে আহতও বটে।

সন্ন্যাসী হেসে বলেন—তাহলে এর মধ্যেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তোমার ?

—কার সঙ্গে ?

—মনে নেই ? তোমায় বলেছিলাম, সে হবে তোমার শত্রু। নিশ্চয় কোন মুঘল ?

চমকে ওঠে পৃথ্বী সিং। সন্ন্যাসীকে মুঘল সেনার কথা বলা কি ঠিক হবে ? তাতে কথাটা পাঁচ কান হবে। করিমবক্সের ক্ষতি হতে বাধ্য। তার এই অবস্থায় কোন ক্ষতি হোক, পৃথ্বী চায় না।

সে বলে—মুঘল কিনা জানিনা। আমি যাই।

তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করে সে। সন্ন্যাসীর কথা বারবার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। বলেছিলেন বটে সন্ন্যাসী, এক জনের সঙ্গে দেখা হবে। গুরুত্ব দেয়নি কোন। অমন অনেক কথা অনেকে বলে নিজেকে জাহির করার জন্য। সন্ন্যাসীর কথা মিলে গিয়েছে। কাকতালীয়। দেখা যাক্, কতদূর গড়ায়। যদি সত্যিই হয়, তাহলে আরও কয়েকবার করিমবক্সের সঙ্গে দেখা হবে তার এবং করিমবক্স একবার তার প্রাণরক্ষা করবে।

পৃথ্বী সিং হেসে ফেলে। গেরুয়া পরলেই মানুষ ভাবে ঐশ্বরিক কোন ক্ষমতা পেয়ে বসে রয়েছে। সন্ন্যাসী যেমন ভুলুয়ার গায়ে হাত রেখে বলে উঠলেন, আর তাঁকে আক্রমণ করবে না। পরিশ্রম আর সংসারের মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে, সন্ন্যাসীর বেশ ধরে অনেকে পালিয়ে বেড়ায়। অথচ সংসারের মোহে লোকালয়ের আশেপাশে ঘুরঘুর করে। নইলে খাদ্য জোটে না কিংবা নিজের সন্ন্যাসীত্ব দেখানো যায় না পাঁচজনকে। তা না দেখাতে পারলে রুটি জুটবে কি করে ?

সূচীভেদ্য অন্ধকার। আকাশে অজস্র তারা—তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই মিটমিট করছে। এরা কী জীবন্ত ? ওদের মধ্যে ওই উত্তর দিকেরটা ধ্রুবতারা। শৈশবে মা তাকে চিনিয়ে দিয়েছিল।

মায়ের মুখেই সে শুনেছে ধ্রুবর কাহিনী। মনেপ্রাণ বিশ্বাস করে। যশোবন্ত সিং-এর পুত্র অজিত সিং-এর মত ধ্রুবও ছিলেন এক রাজার সন্তান। তখনকার দিনেও যুদ্ধ হত।

দ্রুতপায়ে ফিরছিল পৃথ্বী। হঠাৎ তার মনে একটা সন্দেহের উদ্রেক হয়। সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস করা যায় তো? নন্দিনীকে ওখানে ফেলে আসাটা কি ঠিক হলো? মন ভরে ওঠে অস্বস্তিতে। অনেকটা দূর চলে এসেছে, গ্রামের একেবারে কাছে। একদিকে নন্দিনী, অপর দিকে করিমবক্স। নন্দিনীর দানাপানি আছে, করিমবক্সের কিছুই নেই। তার ওপর সে অসুস্থ। মন ছট্‌ফট্ করলেও আগে তার কাছেই যেতে হবে। সন্ন্যাসীর মুখ দেখে তাকে খারাপ লোক বলে মনে হয় না। মুখ দেখে অনেক সময় ঠকে গেলেও, মানুষকে বিচার করতে গেলে তার মুখের দিকেই চাইতে হয়। সেই মুখ যদি অভিনয়ে পারদর্শী হয়, তাহলে অন্য কথা। কারণ এই অভিনয় বুঝতে আরও দু-তিন দিন লাগে।

একটা কুটিরের বাতায়নে ছোট্ট প্রদীপ জ্বলছিল। পৃথ্বী সিং-এর মুখে হাসি ফোটে। রুক্মিণী বসে রয়েছে ওখানে। কোন মুঘল যদি দৈবাৎ দেখে ফেলে ওর রূপ তাহলে ওর প্রায়ান্ধ বৃদ্ধ বাবা ঠেকাতে পারবে না। ঈশ্বরের কৃপায় এ-পথে মুঘলরা আসে না দুর্গাদাসের ভয়ে। রুক্মিণীকে মানা করে লাভ নেই। পৃথ্বীকে ফিরতে না দেখলে সারারাতই ওইভাবে বসে থাকবে। বাড়ি ফেরার এটাই পৃথ্বীর সোজা পথ।

রুক্মিণীর প্রদীপ দপ্ করে নিভে যায়। নিজেকে লুকোতে চায় সে। বুঝতে পেরেছে পৃথ্বী আসছে।

পৃথ্বী বাতায়নের কাছে দাঁড়িয়ে বলে—যারা যুদ্ধ করে, তারা রোজই বাড়ি ফেরে?

রুক্মিণী বলে—না। কোনদিনই হয়ত ফেরেনা কেউ। তবু বসে থাকে কত মেয়ে।

— জানো এতে ভীষণ ক্ষতি হয় ?

— কী ক্ষতি ?

— ধর, যুদ্ধ করতে করতে কারও মনে হতে পারে একজন রাত জেগে অপেক্ষা করছে। তাতে কর্তব্যে শিথিলতা আসতে পারে। কিংবা অসতর্ক হবার ফলে প্রাণ যেতে পারে।

— না। তা কেন ? সে তার কাজ করবে। কখনো তার ভাবা উচিত নয়, একজন রুক্মিণী বসে রয়েছে তার জন্যে। তাহলে সে কাপুরুষ — সে কখনো দেশপ্রেমিক নয়।

— বুঝেছি। কিন্তু বিয়ের আগেই যদি এতো, পরে কি হবে ?

— আগে-পরের তফাৎ কোথায় ? সবই সমান। অবশ্য আমার কাছে। তোমাদের কথা কি করে জানব ?

— সত্যি ?

— সত্যিই তো। তোমরা পুরুষ। তোমাদের মনে কী ধরণের চিন্তা হয়, মেয়ে হয়ে কি বলতে পারি ?

— তবু, একটু অনুমান করে বল।

রুক্মিণী হেসে বলে — এখন কি অত সময় আছে ?

পৃথ্বী সচেতন হয়ে বলে — না। সত্যিই নেই। আমি চলি রুক্মিণী। এখুনি এক জায়গায় যেতে হবে।

— এই রাতে ? নন্দিনী কোথায় ?

— তাকে রেখে এসেছি। খুব কাছেই যাব। একটু পরেই ফিরব। তুমি শুয়ে পড়।

— তোমার খাওয়া হয়নি ?

— না। বাড়ি গিয়ে খেয়ে নেব।

— কোথায় যাবে ?

— কাছেই। পরে বলব।

পৃথ্বী বাড়ি গিয়ে খেয়ে নিয়ে কিছু খাবার ও একটি বড় জলের পাত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি বার হয়ে পড়ে। রুক্মিণীর ঘরের প্রদীপ না

জ্বললেও সে নিশ্চয় দাঁড়িয়ে ছিল। জানে, পরে সবকিছুই জানতে পারবে।

দ্রুত করিমবক্সের কুঠিরের সামনে গিয়ে দেখে দরজা হাট করে খোলা। তবে কি রাতের আঁধারে পালিয়ে গেল? ওই পা নিয়ে কীভাবে যাবে? তাছাড়া রাঠোররা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যোধপুরের রাস্তা সারারাত ধরে পাহারা দেয়। ধরা পড়ে যাবে। আর ধরা পড়লে অসুস্থ বলে ছেড়ে দেবেনা কেউ।

ধীরে ধীরে ঘরে ঢোকে পৃথ্বী। ঘরের ভেতরটা আরও বেশী অন্ধকার। একটা প্রদীপ রয়েছে ঘরে। মাঝে মাঝে রাত কাটাতে হয় বলে পৃথ্বী সেটি রেখে দিয়েছে। কিন্তু সেটি জ্বালাবার আগে সে এক পা এক পা করে খড়ের শয্যার দিকে যায়। ইতিমধ্যে করিমবক্স পালিয়ে গেলে প্রদীপ জ্বেলে লাভ নেই। তার কাছে কোন অস্ত্র নেই। তবু পৃথ্বী প্রস্তুত হয়েই ঘরে ঢুকেছে। খাবার ও জলের পাত্র বাইরে রেখেছে।

শয্যার কাছে যেতেই একটা কাতরোক্তি কানে যায়। পালায়নি করিমবক্স। সে সত্যিই অসুস্থ। তাড়াতাড়ি প্রদীপটি নিয়ে জ্বালায় সে। দেখে ছট্‌ফট্ করছে করিম। চোখে আলো পড়তে সে চোখ খোলে — আরক্ত চোখ।

— পানি। একটু পানি দেবে?

— হ্যাঁ দেব। খাবারও এনেছি। কিছু খেয়ে নাও।

— নাঃ, ইচ্ছে নেই।

— তবু খাও একটু।

— রেখে দাও। পরে খাব।

পৃথ্বী জল এনে দিলে করিমবক্স অনেকটা পান করে। তৃপ্তিতে চোখ বন্ধ করে।

— তোমার পায়ের যন্ত্রণা কি খুব বেড়েছে?

— পায়ের যন্ত্রণা বুঝতে পারছি না ততটা। সারা গায়ে যন্ত্রণা। অনেকদিন আগে একবার হয়েছিল। দুতিনদিন ছিল। এর তুলনায়

পায়ের যন্ত্রণা কিছুই নয়।

—আমি থাকব এখানে?

—তুমি? থাকবে?

—হ্যাঁ। তোমার যদি দরকার হয়?

—না না। কোন দরকার নেই। যথেষ্ট করেছ তুমি।

কোন অশ্বারোহী সেই সময় কুটিরের দিকে আসছে মনে হল। পৃথ্বী ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে দেয়।

একটু পরেই বাইরে থেকে একজন চেঁচিয়ে ওঠে—আলো নিভিয়ে ফেললি কেন পৃথ্বী? তোর কাছে এলাম গল্প করতে।

করিমবক্সের কানে কানে পৃথ্বী বলে—একটুও শব্দ করো না।

সে দরজার সামনে এগিয়ে গিয়ে বলে—আজ সারাদিন খাটুনি গিয়েছে। আজকে আর গল্প করব না অমর। আজ বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ব।

—যাঃ, এখুনি ঘুমোবি কি? চল্, ভেতরে চল্।

—না, আজ বাড়িতে যাব এক্ষুনি। চল্।

—বুঝেছি।

—কি বুঝলি?

—নিশ্চয় রুক্মিণী জেগে বসে আছে।

রুক্মিণীকে নিয়ে কোন রসিকতা পৃথ্বী খুব অপছন্দ করে। কিন্তু এখন কাষ্ঠহাসি হেসে বলে—যা বলেছিস। ওর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। সত্যিই হয়ত দেখা যাবে তাকে।

—চল্ তবে।

—তুই কোথায় গিয়েছিলি?

—জানিস না? মুঘলদের পেছনে তাড়া করে যোধপুরের আধ্যেক পথ পার করে দিয়ে এলাম। সামান্য কয়েকজন ছিল। কী ছোটাই ছুটল ওরা।

—তুই গাঁয়ে ছিলি না? তোর তো গাঁয়ে থাকার কথা।

—হ্যাঁ। আমি পাহাড়ে যাইনি। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সেই সময় দেখলাম ওদের তাড়া করে নিয়ে আসছে আমাদের লোক। আমিও ছুটে গেলাম।

—অন্যায় করেছিস। ও ভাবে যাস্ না।

—জানি। আমি কি ইচ্ছে করে গিয়েছি নাকি? হঠাৎ হয়ে গেল। কিন্তু ওদের আসল লোকটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। ঘোড়া থেকে ছিট্‌কে পড়ে একেবারে নাকি হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। তুই কোনদিকে ছিলি?

—একেবারে পেছনে।

—তোর দেখা উচিত ছিল।

—দেখতে পাইনি।

—আমার মনে হয় লোকটা পাহাড়ের গায়ে কোথাও আটকে আছে। ভাল করে খুঁজে দেখা দরকার।

—মরে না গেলে যাবে কোথায়? ধরা পড়ে যাবে।

পৃথ্বী মনে মনে ভাবে, সে কি বিশ্বাসঘাতকতা করছে? মুঘলরা তাদের চরম শত্রু। তারা মাড়োয়ারকে করে রেখেছে পদানত। তারা দিনের পর দিন অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। কত নিরীহ লোক প্রাণ দিচ্ছে। কত নারী নির্যাতন সইছে। তবু তাদের এক দলপতিকে সে হত্যা না করে লুকিয়ে রেখেছে। গ্রামের লোক, দেশের লোক জেনে ফেললে কেন ভাববে না যে সে বিশ্বাসহন্তা? কেন তাকে ঘৃণা করবে না? কিন্তু দুর্গাদাস? তিনিও কি ওপর-ওপর বিচার করবেন? মুঘলরা যত বড় শত্রুই হোক না, মানুষ হিসাবে মানুষের ওপর তো একটা কর্তব্য রয়েছে। আহত কিংবা নিরস্ত্র কাউকে সে শত চেষ্টাতেও হত্যা করতে পারবে না। এটা হয়ত তার দুর্বলতা। তবু একজন মানুষকে আহত দেখে সে পাহাড়ের গায়ে ছেড়ে দিয়ে আসতে পারবে না।

দুর্গাদাসের সাক্ষাৎ পেলে সে তাঁকে জিজ্ঞাসা করত নিশ্চয়।

বলেও দিত করিমবক্সের কথা। কিন্তু অন্যদের ওপর নির্ভর করা যায় না। ক্ষেপে আছে সবাই। ক্ষিপ্ত মানুষের বিচার বুদ্ধির স্থিরতা থাকে না।

চলতে চলতে অমর সিং প্রশ্ন করে—কী অত ভাবছিস্ রে পৃথ্বী সেই থেকে? মুখখানা এত গম্ভীর হয়ে আছে কেন?

—ভাবছি সেই মুঘল দলনায়কের কথা। ধর্ সে আহত হয়ে পড়ে রয়েছে, কিংবা ধর্ সে আহত অবস্থায় এই গাঁয়ের দিকেই এগিয়ে আসছে। তুই দেখতে পেলে কি করবি?

অমর সিং হো হো করে হেসে ওঠে। বলে—এটা আবার সমস্যা নাকি? মুণ্ডুটা ছিটকে ফেলে দেব দেহ থেকে।

—সে যদি নিরস্ত্র থাকে? যদি সে অসুস্থ হয়?

—শত্রুর আবার বাছবিচার আছে নাকি? তুই সাধু হয়ে গেলি নাকি? ও তোকে নিরস্ত্র দেখলে কি করবে?

—জানি না! হয়ত মেরে ফেলবে। আবার নাও মারতে পারে। মানুষকে কি সহজে চেনা যায়?

—যা বাবা! তুই তলোয়ার ছেড়ে চারণ কবি হয়ে যা।

—আচ্ছা ধর্, লোকটা কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। তুই পেছন দিক দিয়ে ছোরা বসিয়ে দিতে পারবি তার পিঠে?

—এমন একটা উঁচু দরের মুঘল সেনা হলে নিশ্চয় পারব। জানিস, লোকটা নাকি অসাধারণ যোদ্ধা। ওরা বলাবলি করছিল।

—জানিনা। কিন্তু তুই কী বললি অমর? তোর মুখে এমন কথা শুনব ভাবিনি।

—আমি এখন মানুষ নই পৃথ্বী। আমি শুধু রাঠোর। রাঠোর মুঘলকে যে অবস্থাতেই পাক, খতম করবে। ওকে যদি কখনো পেছন থেকেও ছুরি মারতে হয় আমি দ্বিধা করব না। ঈশ্বরের কাছে সেই প্রার্থনাই করব।

পৃথ্বীর মন ব্যথায় ভরে ওঠে। অমর খুবই সাদাসিদে। তার

ভেতরে কোন পাপ নেই। হয়ত বুদ্ধি তার তেমন তীক্ষ্ণ নয়। অথচ মুঘল সম্বন্ধে সে কী সাংঘাতিক রকমের স্পর্শকাতর। এমন হওয়াই বোধহয় উচিত। কিন্তু সে তো হতে পারছে না?

—বাড়ি গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে নে পৃথ্বী। নইলে নানা উদ্ভট চিন্তা মাথায় আসতে থাকবে অনবরত। সারা দিন নিশ্চয় খাস্‌নি?

—খেয়েছি।

—তবে? পেটের কোন গোলমাল?

—না। ভাল কথা, তুই একটা কাজ করতে পারবি?

—বল্‌।

—আমার নন্দিনীর আস্তানায় একজন সাধু এসে জুটেছে। দিব্যি আগুন জ্বালিয়ে চাপাটি বানাচ্ছে। তোর ঘোড়া আছে। চট্‌ করে গিয়ে দেখে আয় ভাই, নান্দিনীকে নিয়ে সরে পড়ল কিনা।

—সাধুকে চোর বলছিস্‌?

—কে যে সাধু আর কে যে চোর বলা মুশকিল। কৌশলে জেনে নিতে পারিস্‌ সে মুঘলদের গুপ্তচর কিনা।

—ঠিক বলেছিস। হতে পারে। সেই মুঘলটাও হতে পারে। কোন সন্ন্যাসীকে মেরে পোষাক নিয়েছে বোধহয়। আমি চললাম। তেমন কিছু হলে এসে তোকে খবর দেব। নইলে কালকে দেখা হবে।

•

ভোরের আলো তখনো ভাল করে ফোটেনি। একটা হাল্‌কা কুয়াসা ঘিরে রয়েছে পাশের পাহাড়টিকে। গাছের পাতায় শিশির বিন্দু। বসন্তের আগমনের মহড়া চলছে—প্রকৃতিতে। মানুষের মনেও তার ছোঁয়াচ হয়ত পড়েছে। কিন্তু কোনরকম বহিঃপ্রকাশ নেই। আগের দিন হলে এই সময়ে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় সাড়া পড়ে যেত। যোধপুরে গিয়ে উৎসবে যোগ দিতে এখন থেকেই তোড়জোড় সুরু হয়ে যেত। ক্ষেত কত রকমের শস্যে পূর্ণ হয়ে থাকত। তাদের

কিছু কিছু কাটা হয়ে যেত।

বসন্ত পঞ্চমী সুরু হবে কদিন পরে। কোকিলের কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে আরম্ভ করেছে। সেই সুর আরও সুমিষ্ট আরও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠবে কদিনের মধ্যেই। পলাশ শিমূল লাল হয়ে উঠছে একটু একটু করে। শীতও কমতে আরম্ভ করেছে। তার পরেই আসবে ফাগের দিন। কিন্তু সেই ফাগ আর আনন্দোচ্ছ্বাসে পরিণত হয় না বেশ কয়েক বছর ধরে। এখন অন্য ফাগের খেলা চলেছে। রক্ত নিয়ে হোলি। এখন শস্যক্ষেত্র নিষ্ফলা। গ্রামগুলো নিঝুম। মানুষের মনে আনন্দের তরঙ্গ উছলে ওঠেনা। রক্তে নেই নেশা।

এই ভোর বেলাতেই পৃথ্বী এসে দাঁড়ায় রুক্মিণীর বাড়ির রাস্তায়। এখন আর জানলা দিয়ে কথা বলা নয়। রুক্মিণীও বার হয়ে এসেছে রাস্তায়। পৃথ্বী তাকে বিস্তারিত ভাবে গতকালের ঘটনা শোনায়।

রুক্মিণীর প্রথমে যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। কিন্তু সবটা শুনে তার মুখ লাল হয়ে ওঠে উত্তেজনায়। একটু চেঁচিয়েই বলে ওঠে—তুমি শেষে একজন মুঘলকে ডেকে এনে আশ্রয় দিলে?

—হ্যাঁ। তোমার মনে যেমন প্রশ্ন জাগছে আমার মনেও জেগেছিল। কিন্তু সারারাত ভাবার পর এখন আর কোন দ্বিধা নেই আমার।

—মুঘলকে আশ্রয় দিয়েও দ্বিধা নেই?

—না রুক্মিণী। কিন্তু আমি বড় আশা করেছিলাম তোমাকে অন্তত সঙ্গে পাব। ভেবেছিলাম, তার দুবেলার খাদ্য তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাব।

—আমাকে ভাবতে হবে।

—আমি বলা সত্ত্বেও?

—হ্যাঁ। সবার ওপর দেশ। আমি বিবেকের কাছে প্রশ্ন করব।

—রুক্মিণী, তুমি না আমাকে ভালোবাসো?

—হ্যাঁ। কিন্তু যদি বুঝি তুমি অপরাধ করেছ, তাহলে ভালো-বেসেও তোমাকে ঘৃণা করব।

—ঘৃণা করবে? আমাকে?

—হ্যাঁ।

—ও। বেশ, তাই করো রুক্মিণী। সেই লোকটাকে ধরিয়ে দেবে না তো?

—বলতে পারি না।

—আমি তাহলে যাই রুক্মিণী। তুমি তোমার বিবেকের কাছে প্রশ্ন করো।

পৃথ্বী ভীষণ আঘাত পায়। সকালেই তার মন বিষণ্ণতায় ভরে যায়। কত আশা আর কত বিশ্বাস নিয়ে সে সাত সকালে রুক্মিণীকে সব বলতে এসেছিল। ভেবেছিল দুই জনের মন একই সুরে বাঁধা। ভেবেছিল তার অন্তরের কথা রুক্মিণী মুহূর্তেই বুঝে ফেলবে। কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব তাকে পৃথকভাবে ভাবতে প্ররোচিত করেছে। করিমবক্সকে ওখান থেকে যেভাবেই হোক সরাতে হবে। এই মুহূর্তে সরাতে পারলে ভাল হত। রুক্মিণী হয়ত বলে দেবে কাউকে। এখন দিনের আলোয় তাকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়াও আর সম্ভব হবে না। অপেক্ষা করতে হবে কতক্ষণে সূর্য ডোবার পর অন্ধকার নেমে আসে। তাছাড়া নিয়ে গিয়ে তুলবে কোথায়? খেতে দেবে কি?

রুক্মিণী আজই তাকে প্রথম মনে করিয়ে দিল যে সে একটি আলাদা মানুষ, তার পৃথক দেহের মত মনও পৃথক। সে পৃথ্বীময় নয়। তবে দুদিন আগে ওকথা বলল না কেন? এই তো শিবরাত্রি আসছে। গতবছর শিবের মাথায় জল দিয়ে তাকে বলেছিল—ঠাকুরকে বলে এলাম, সব জন্মেই যেন তোমাকে পাই। প্রণামও করেছিল তাকে। সেই মুহূর্তে রুক্মিণী যেন তার চোখের সম্মুখে অন্য রূপ নিয়ে ধরা দিয়েছিল। পৃথিবীর চেহারাও পালটে গিয়েছিল।

কিন্তু আজ? আর এক শিবরাত্রি আসছে। পৃথ্বীর মন সে বুঝতে

চাইল না। অবিশ্বাস করল তাকে। সে কি করে ভাবল, পৃথ্বী দেশপ্রেমিক নয়? এক মুহূর্তের মধ্যে চিরকালের একজন পরিচিতের সম্বন্ধে এমন একটা ধারণা যার মনে জন্মায় সে কেমন করে চিরকালের মনের মানুষ হতে পারে? এতদিন তবে নিজেই নানান্ কল্পনা করেছিল সে। সেই কল্পনা ছেড়ে মুক্ত হতে হবে। একলা চলতে হবে তাকে। রুক্মিণী কিছুদিন তার মনের এককোণে চাপা পড়ে থাক। পরে আবার ঝেড়ে-পুছে নিয়ে দেখা যাবে। তখন যাচাই করে দেখতে হবে। এমন আবেগ আর ভালোবাসার দুর্বলতায় বিশ্বাস করা চলবে না। তাতে রুক্মিণীকে যদি ছেড়ে দিতে হয়, ক্ষতি কি?

সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি চলে যাচ্ছিলেন।

—চলে যাচ্ছেন?

মৃদু হেসে সন্ন্যাসী বলে—হ্যাঁ, তোমার নন্দিনী নিরাপদেই আছে। আমি দানা মেখে দিয়ে এসেছি।

—একথা বললেন কেন?

—বন্ধুকে পাঠিয়েছিলে, ঘোড়া চুরি করছি কিনা দেখতে।

পৃথ্বী সিং নির্বাক।

সন্ন্যাসী বলে—তাতে কিছু মনে করিনি আমি। নন্দিনীকে তোমার কতখানি দরকার আমি জানি।

—অমর আপনাকে অপমান করেছে?

—পাগল হয়েছ? সে একটা কথাও বলেনি। কিন্তু তার হাবভাব দেখে বুঝে ফেলেছি। সে ধরে নিয়েছিল আমি সন্ন্যাসীর বেশে গুপ্তচর।

—অমর একটা হাঁদারাম।

—না না। সে মোটেই বোকা নয়। অন্য কেউ হলে বুঝতে পারত না। সে অনেকক্ষণ ধরে সলা করেছিল আমার সঙ্গে। তার কথায় কোনরকম অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নি। কিন্তু তার কৌতূহল

আমি ধরে ফেলেছি। সেজন্যে আমি কিছু মনে করিনি।

—তাহলে থেকে যান।

—না। আমাকে যেতে হবে। তোমার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল। তোমার গাঁয়ের দিকেই যাচ্ছিলাম। ভালই হল, তুমি এসে পড়ায়।

—কেন দেখা করতে চেয়েছিলেন ?

—তাকে রেখেছ কোথায় ?

—কাকে ?

—যার সঙ্গে দেখা হয়েছে কাল ? তোমার শত্রু যে—

মুহূর্তের দ্বিধা পৃথ্বীর মনে। তারপর পরিষ্কার ভাষায় বলল—সে একজন মুঘল সেনাপতি। অসুস্থ সে। তাকে লুকিয়ে রেখেছি। কিন্তু সবাই জেনে ফেলবে শিগ্‌গির। ভাবছি কি করব।

—কি ঠিক করলে ?

—তাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। সুস্থ না হয়ে উঠলে, ছেড়ে দিতে পারি না। সবাই বলবে আমি বিশ্বাসঘাতক। ভাববে, আমার মধ্যে দেশপ্রেম বলতে কিছু নেই। ভাবুক। একজন এর মধ্যেই বলে ফেলেছে সেকথা। আপনি কি মনে করেন ? আমি বিশ্বাসঘাতক ? একজন নিরস্ত্র মানুষকে বধ করা সম্ভব ? হোক্ সে মুঘল !

—তুমি কাকে বলেছ ?

পৃথ্বীর মুখ লাল হয়ে ওঠে। সে বলে—রুক্মিণী নামে একটি মেয়েকে। আমি জানতাম সে আমাকে খুব ভালবাসে। ভাবতাম, তার আর আমার মনও এক। আজ প্রথম বুঝলাম সে একজন আলাদা মানুষ।

—তুমি ভুল করেছ রুক্মিণীকে বলে। বরং দুর্গাদাসকে বললে পারতে।

—হ্যাঁ। আপনি সন্ন্যাসী বলে আপনাকে বললাম। আচ্ছা

বলুন তো আমি কি বিশ্বাসঘাতক ?

—না পৃথ্বী সিং। তুমি মানুষের কাজ করেছ। যুদ্ধে মানুষ মারা এক কথা। কিন্তু একা অসুস্থ মানুষকে পেয়ে বধ করা উচিত নয়।

পৃথ্বীর মনের বোঝা অনেকটা হাল্‌কা হয়। সে বলে—মানুষটি রীতিমত বীর। সে অস্ত্র সমর্পণ করেনি। আহত অবস্থায় যুদ্ধ করেছে। তারপর তার তলোয়ার ভেঙে গেল। পায়ে আঘাত ছিল বলে ঠিকভাবে লড়তে পারেনি।

—তুমি দুর্গাদাসের জন্যে অপেক্ষা করো। আমি তাক খবর দেব।

—আপনি ? তাঁকে আপনি চেনেন ?

—সে-ও আমাকে চেনে। আজ সন্ধ্যার মধ্যেই সে কিংবা তার কোন অনুচর এখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবে। তুমি এখানেই অপেক্ষা করো যেন।

সন্ন্যাসী চলে গেলে পৃথ্বী ভেবে কুল-কিনারা পায় না। লোকটি রহস্যজনক। দুর্গাদাসের সঙ্গে সত্যিই কি সম্পর্ক রয়েছে ? করিম-বক্সের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে তার ভবিষ্যৎবাণী মিলে গিয়েছে বটে। তাই বলে, দুর্গাদাসের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি এতই ঘনিষ্ঠ যে তাঁর সর্বশেষ অবস্থান সম্বন্ধেও তিনি ওয়াকেবহাল !

পৃথ্বী নন্দিনীকে নিয়ে গ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। করিমবক্সের খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে। রুক্মিণীকে সব কথা বলে ফেলে মহা বিপদ হয়েছে। অমর সিং-এর সঙ্গে তার যদি দেখা হয়ে যায় তাহলে অমরকে হয়ত সব কথা বলে দেবে। আর অমর তো পেছন থেকে ছুরি মারতেও দ্বিধা করবে না বলেছে, কোন মুঘলকে দেখতে পেলে।

পৃথ্বী পাশের গ্রামের দিকে রওনা হয়। সেখানে চেনা-জানার অভাব নেই। তাদের কাছ থেকে কিছু খাবার চেয়ে আনতে অসুবিধা হবে না।

মাথার নীচে দুখানা হাত রেখে ওপর দিকে তাকিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছিল করিমবক্স। তার দেহের তাপ কিছুটা কম। গায়ে ব্যথা রয়েছে বটে, তবে অসহনীয় নয়। পায়ের অবস্থা কেমন আছে বুঝতে পারে না।

পৃথ্বী সিং খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকতে সে তার মুখের দিকে চায়।

—কেমন আছ আজ ?

—ভাল।

পৃথ্বী খাবার রাখে। জলপাত্রে জল ঢেলে দেয়।

—তুমি নিজে খেতে পারবে তো ?

—হ্যাঁ। এখন রেখে দাও। পরে খেয়ে নেব।

—তুমি বিপদের মধ্যে আছো। মুখের খাবার এভাবে রেখে দিও না।

করিমবক্স হাসে। বলে—তোমাদের এই গ্রামের নাম কি ?

—তা কি বলা যায় ? তুমি দলবল নিয়ে এসে অত্যাচার করবে।

—তুমি আমাকে বন্দী করে রাখবে না ?

—জানি না। আজ সন্ধ্যার মধ্যে সে কথা বলতে পারব। এই চাপাটি চিবোতে তোমার ভাল লাগছে না জানি। বড় গরীব এ-দেশ। তোমাদের মত খানা আমরা কোথায় পাব ?

—আমাকে অত ছোট ভেবো না।

—না ভাবিনি। তাই তোমার সঙ্গে একটা চুক্তি করতে চাই। দেখব, মুঘলরা কতখানি কথার দাম দেয়।

—কিসের চুক্তি ?

—তুমি আমাকে কথা দেবে দশদিনের মধ্যে পালিয়ে যাবার কোনরকম চেষ্টা করবে না।

করিমবক্স হেসে ফেলে। তারপর সে ভাবতে থাকে। ভাবতে ভাবতে বেশ গম্ভীর হয়। একটু পরে পৃথ্বীর মুখের দিকে চেয়ে বলে

–আমার শরীর দিন চারেকের মধ্যেই ভাল হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। তবে দুর্বলতা থেকে যাবে। পায়ের চোট কেমন আছে জানি না। ফোলা একটু কমেছে বোধ হয়। চারদিন পরে হাঁটতেও পারব। অর্থাৎ বাড়তি আরও ছয়টা দিন।

–হ্যাঁ। আমি হিসেব কষেই বলেছি। তোমার পা দেখে মনে হয় দুদিন পরেই হাঁটতে পারবে।

–ও। তুমি দেখে নিয়েছ? তখন ঘুমোচ্ছিলাম বোধহয়। যদি চুক্তি করি তোমার সঙ্গে, তাহলে দশদিন পরে আমার অবস্থাটা কেমন হবে?

–দশদিন পর থেকে তুমি চুক্তি-মুক্ত হবে।

–অর্থাৎ পালাতে পারব?

–পালাতে পারবে কিনা জানি না। পালাবার স্বাধীনতা পাবে।

–হুঁ। বেশ চুক্তিবদ্ধ হলাম। দশদিন আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

পৃথ্বী হেসে বলে–একদিক থেকে নিশ্চিন্ত হলাম। এখন আমাকে দেখতে হবে, তোমাকে যাতে কেউ খুঁজে না পায়।

– তুকি কি নিজের দায়িত্বে রেখেছ আমাকে?

–এখন পর্যন্ত তাই। তুমি বিশ্রাম নাও করিমবক্স। আমি চলি।

– তোমার নন্দিনীর পায়ের শব্দ শুনে, কেন যেন আনন্দ হয়েছিল একটু আগে।

– নন্দিনীর পায়ের শব্দ চিনতে পেরেছিলে?

করিমবক্স মাথা ঝাঁকিয়ে বলে–বড় ভাল ঘোড়া। ওটা নিয়ে পালাতে পারলে খুশী হতাম।

–শত চেষ্টাতেও ওকে পাবে না তুমি। নন্দিনীর পায়ের শব্দে যতই আনন্দ পাও।

— না, সেজন্য নয়। আমি জানতাম, নন্দিনীর সওয়ার কে হতে পারে।

— আমি আসছি বলে তোমার আনন্দ হচ্ছিল? তুমি এইকথা বলতে চাইছ করিমবক্স?

— অস্বীকার করতে পারি না। কথা বলার কেউ নেই। তুমি রাজপুত ঠিকই, কিন্তু মানুষ তো বটে। মানুষ একা থাকতে পারে না। পাশে একদল শত্রু থাকলেও তার সঙ্গে অন্তত কথা বলা যায়। তুমি নিজের গ্রামে আছো। তোমার স্ত্রী কিংবা প্রেমিকা আছে হয়তো। তোমাকে আমার হিংসে হয় না পৃথ্বী। আমি জানি আমি বন্দী। তবু নিঃসঙ্গতাবোধ আসে বৈকি।

পৃথ্বী তার ঠোঁট কামড়ে ধরে। ভাবে স্ত্রী কিংবা প্রেমিকা থেকেই বা লাভ কি মানুষের? নিজের আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে স্ত্রীর মনোমত আদর্শে সায় না দিলেই যেখানে সুর কেটে যায়, সেখানে প্রেমিকার অস্তিত্বকে স্বপ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই ভাল।

মুখে বলে, — আমার জন্যে তুমি যে কিছুটা অভাব বোধ করছ সেজন্য ধন্যবাদ করিম।

— ধন্যবাদে প্রয়োজন নেই। এটাকে বলতে পারো সাময়িক আকর্ষণ। তোমাকে যদি ভবিষ্যতে কখনো পাই, ভেবো না ছেড়ে দেব। মুঘল হিসাবে, দুর্গাদাস যতদিন আত্মসমর্পণ না করছে, অজিত সিং যতদিন ধরা না দিচ্ছে, তোমরা আমার শত্রু। সেই রকম ব্যবহারই পাবে তুমি আমার কাছে।

— জানি। সেজন্যে আমি প্রস্তুত।

করিমবক্সের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পৃথ্বী চলে যায় নন্দিনীর কুটিরে। সন্ন্যাসী অপেক্ষা করতে বলেছেন। ভোরবেলা রুক্মিণীর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে সারাদিন তাকে এড়িয়ে চলেছে। অন্যপথ দিয়ে ঘুরে বাড়ি গিয়ে দুপুরের খাওয়া খেয়ে নিয়েছে। করিমবক্স স্বীকার না করলেও, সে বুঝেছে খেতে তার অসুবিধা হচ্ছে।

দুধ বড় দুর্লভ এই গ্রামে। দু'চারটে গরু যা রয়েছে, শিশু আর বৃদ্ধের যোগান দিতেই সেই দুধ শেষ হয়ে যায়। মাংসও অতটা জোটে না। বন্য পশু আর পাখী শিকারের সময় কোথায়?

অমর সিং কোথায় গেল কে জানে? রুক্মিণী তাকে ডেকে করিমবক্সের কথা বলে না দেয়। বলে দিলে, অমর সিং কি একবার তাকে জিজ্ঞাসাও করবে না, করিমকে হত্যা করার আগে? সে বড় সরল। রুক্মিণীর যুক্তিতে অভিভূত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে যথেষ্ট।

নন্দিনীর কুটিরে যখন পৌঁছোয় তখন বিকেল। সময় কাটাবার জন্যে পৃথী নন্দিনীর গা ঘসে ঘসে চকচকে করে তোলে। বেশী করে জল ভরে রাখে। ঘরের ভেতরটা পরিষ্কার করে ফেলে। তবু সময় কাটে না।

তখন সে নন্দিনীর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। কথা বলতে বলতে এক সময় কথাও ফুরিয়ে যায়। ক্লান্তিতে ঝিমোতে থাকে।

দূরে আওয়াজ শোনে। মুখ তুলে দেখে পাহাড়ের পথ ধরে কয়েকজন অশ্বারোহী ছুটে আসছে। সূর্যের দৃষ্টি তখন রীতিমত তির্যক।

অশ্বারোহীদের সামনে একজন—পেছনে চারজন। তারই দিকে আসছে। সন্ন্যাসী ঠিকই খবর দিয়েছে তবে দুর্গাদাসকে। করিমবক্সের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে কিছুক্ষণ বাদেই। সেই সঙ্গে তারও ভাগ্য চিহ্নিত হয়ে যেতে পারে। তবে দুর্গাদাসের নির্দেশ থাকলেও জীবিত অবস্থায় সে করিমবক্সের কোন ক্ষতি হতে দেবে না।

সেই সামনের অশ্বারোহীকে সে চিনতে পারে। সন্ন্যাসী তবে কে? এ যে দুর্গাদাস স্বয়ং। ছুটে এগিয়ে আসে সে সামনের পথের ওপর।

দুর্গাদাস তাঁর কোষমুক্ত তলোয়ার আকাশের দিকে উঁচিয়ে ধরেন। দূর থেকে সাড়া দেবার এটি তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই

বৈশিষ্ট্য এখন মাড়োয়ারের সব সেনার অভিবাদনের প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথ্বী একদৃষ্টে বয়স্ক এই যোদ্ধার তেজোদীপ্ত ভঙ্গী দেখতে থাকে। সে ভুলে যায়, দুর্গাদাস তার ওপর ভীষণ রুষ্ট হয়ে থাকতে পারেন। ভাবে, এত বয়সেও কি সুন্দর স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ চেহারা। অনেক দিন পর দেখল সে। দিনের আলোয় এত কাছ থেকে কতদিন দেখেনি।

বিনীত ভাবে অভিবাদন জানায় পৃথ্বী।

– তুমিই তো পৃথ্বী সিং?

– আজ্ঞে হ্যাঁ।

– হুঁ।

দুর্গাদাস বেশ কিছুক্ষণ পৃথ্বীর দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। পৃথ্বী বুঝতে পারে না কী দেখছেন তিনি তার মধ্যে। সে বিশ্বাসঘাতক কি না? কিন্তু সেরকম অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তো নয় তাঁর চোখে।

– দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আমি এখানে বিশ্রাম নিতে আসিনি। তোমার অশ্ব নিয়ে চল।

পৃথ্বী নন্দিনীর কাছে গিয়ে তার পিঠ চাপড়ে ফিসফিস্ করে বলে – অনেক বিশ্রাম হয়েছে। এবারে চল্। তোর সঙ্গে জন্মের মত ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতে পারে।

নন্দিনীর পিঠে চাপতেই দুর্গাদাস তাকে অনুসরণ করতে বলেন। তাদেরই গ্রামের দিকে এগিয়ে যান তিনি। মাড়োয়ারের প্রতিটি পথ-ঘাট, পাহাড়-পর্বত, মরুপ্রান্তর তাঁর নখদর্পণে। একটু পরে কী আদেশ হবে অনুমান করতে পারে পৃথ্বী। নিজেকে সে প্রস্তুত করে। কিন্তু সন্ন্যাসী এত তাড়াতাড়ি পায়ে হেঁটে দুর্গাদাসের কাছে খবর পৌঁছে দিলেন কি করে? তিনি দুর্গাদাসের আস্তানার খবর ভালভাবেই জানেন। সে নিজে তো জানে না। রাঠোরদের কেউ-ই জানে না। শুধু যখন ডাক আসে, ছুটে যায় তারা।

গ্রামের কাছে এসে দুর্গাদাস বলেন—সামনে এসো পৃথ্বী সিং। সেই লোকটার কাছে আমাকে নিয়ে চল।

পৃথ্বী সামনে আসে। সে দুর্গাদাসের মুখের দিকে তাকাতে পারে না। তাকিয়ে লাভ নেই।

কুটিরের সামনে এসে নন্দিনীর পিঠ থেকে এক লাফে নেমে পড়ে পৃথ্বী। তারপর তলোয়ার উন্মুক্ত করে দরজার সামনে দাঁড়ায়।

বিস্মিত দুর্গাদাস প্রশ্ন করেন—এর মানে?

পৃথ্বী বিনীতভাবে বলে—একে আমি আশ্রয় দিয়েছি। জানিনা আমি বিশ্বাসঘাতক কিনা। কিন্তু এর প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব আমার। আপনি একে বন্দী করতে পারেন। কিন্তু হত্যা—কখনই নয়।

—হুঁ। বুঝলাম। তুমি আমার বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধরতে চাও?

—না। অস্ত্র ধারণ করা নিয়ম। আমি জানি আপনি সহজেই আমাকে পরাস্ত করবেন। তারপর নিশ্চিন্তে ভেতরে প্রবেশ করুন।

—ঠিক আছে। সরে দাঁড়াও। ওকে আমি হত্যা করব না।

দুর্গাদাসের মুখের কথার মূল্য লক্ষ মাণিকের চেয়েও বেশী। নির্দ্বিধায় সরে দাঁড়ায় পৃথ্বী সিং। সে দেখতে পায় দুর্গাদাসের অনুচরেরা ক্রোধে কাঁপছে। কিছু এসে যায় না তাতে। দুর্গাদাস নির্বিকার।

করিমবক্স নিদ্রিত ছিল। পৃথ্বী তাকে ডেকে তোলে। চোখ মেলে ঘরের মধ্যে এত লোককে দেখে তার মুখে ফিকে হাসি ফুটে ওঠে।

পৃথ্বীর দিকে চেয়ে বলে—তুমিই হেরে গেলে শেষ পর্যন্ত। আমি কিন্তু চুক্তি ভঙ্গ করিনি। করতামও না। মৃত্যুর আগে তোমার সম্বন্ধে অন্য রকম ধারণা নিয়ে যেতে কষ্ট পাচ্ছি পৃথ্বী সিং।

দুর্গাদাস মুঘল সেনানায়কের দিকে চেয়ে বলেন—কী তোমাদের চুক্তি?

—সে কথা বলে লাভ কি? ওটা পৃথ্বীর খেয়াল হয়ত। কথা

দিয়েছিলাম সুযোগ পেলেও দশদিনের মধ্যে পালাবো না। স্বেচ্ছা-বন্দী হয়ে থাকব।

—তোমরা, মুঘলরা এ-ধরণের চুক্তিতে অভ্যস্ত কি?

—না। আমরা বন্দী করি কিংবা মেরে ফেলি। কিন্তু অসিযুদ্ধে আমাকে পরাস্ত করেও পৃথ্বী সিং আমাকে বাঁচিয়ে রাখল। নিয়ে এল এখানে। আমি অসুস্থ। পৃথ্বী আমার যত্ন করল যতটুকু পারল। তারপরে দশদিনের চুক্তি। আমি কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু পৃথ্বীই হেরে গেল শেষ পর্যন্ত।

—হ্যাঁ। শত্রুকে কেউ মুক্তি দেয় না। সেই শত্রু তোমার মত দক্ষ সেনানায়ক হলে তো কখনই নয়।

—পৃথ্বী বলেছে একথা?

—না। আমি জানি। সেই জন্যেই এনায়েৎ খাঁ হাসানকে না পাঠিয়ে তোমাকে পাঠিয়েছিল ঝালোরের রাস্তা শত্রুমুক্ত করতে।

চমকে ওঠে করিমবক্স—কে আপনি?

—আমি দুর্গাদাস। আমার নাম তুমি শুনেছ। কারণ অনেক দিন যুদ্ধ করছি তোমাদের সঙ্গে। ঈশ্বরের কৃপায় আরও অনেকদিন তোমাদের বিব্রত করব আশা রাখি। তিনি শেষ পর্যন্ত আমাদের অনুকূলেই সিদ্ধান্ত নেবেন। কারণ আমি মাতৃভূমিটুকু শুধু মুঘলদের গ্রাস থেকে উদ্ধার করে আসল রাজাকে সিংহাসনে বসাতে চাই। এতে অন্যায় নেই। তোমাদের বাদশাহের উদ্দেশ্য কলুষিত।

করিমবক্স উত্তেজনায় শয্যা ছেড়ে উঠে বসে। দুর্গাদাসের সঙ্গে এমন অভাবনীয় ভাবে সাক্ষাৎ হবে কল্পনাও করেনি। তাই ভালভাবে দেখে নেয়। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের দিকে যে-দৃষ্টিতে চায় সেই দৃষ্টিতেই দেখতে থাকে দুর্গাদাসকে।

—আপনিই দুর্গাদাস। ভালই হল। মৃত্যুর আগে শুধু একটি অনুরোধ করে যাব। পৃথ্বী সিং-এর কোন ক্ষতি করব না।

—তোমার মৃত্যু হবে কে বলল?

— তবে ? বন্দী করবেন ?

— তোমার মৃত্যুর আগে, পৃথ্বীর মৃত্যু হত। সে আমাকে তলোয়ার খুলে বাধা দিয়েছিল। আমি কথা দিয়েছি, তোমাকে হত্যা করা হবে না। তখন সে সরে দাঁড়াল।

করিমবক্স ভাবে সে স্বপ্ন দেখছে। দেশের নেতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ — এ যে ভাবতেও পারা যায় না। আর তারপর সেই নেতা কথা দিলেন যে তাকে বধ করবেন না ? এসব কি শুনছে সে ?

দুর্গাদাস আবার বলেন, — পৃথ্বী আমার লোক। তোমার সঙ্গে তার যে চুক্তি হয়েছে, আমি কি করে তার খেলাপ করব ?

পৃথ্বী সিং বিমূঢ় হয়ে পড়ে — করিমবক্স ততোধিক।

দুর্গাদাস হেসে বলেন — রাজপুতদের এটা একটা বিরাট দুর্বলতা। তারা শত অসুবিধার মধ্যেও মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিতে পারে না। এই দুর্বলতার সুযোগ যুগে যুগে নিয়ে আসছে শত্রুপক্ষ। তবু আমাদের চেতনা হয় না — শিক্ষা হয় না। এই দুর্বলতার সুযোগেই তুমি তোমার প্রাণ পেয়ে গেলে। আমি জানি মুঘল শিবিরে তোমার ফিরে যাওয়ার অর্থ আমাদের বিপদ আরও একটু ঘনীভূত হওয়া। তবু তোমাকে বধ করতে পারলাম না।

স্তম্ভিত করিমবক্সের সামনে থেকে দুর্গাদাস বাইরে চলে আসেন। পৃথ্বীকে কাছে ডেকে বলেন — কী খেতে দিয়েছ একে ?

পৃথ্বী সঙ্কোচে সব জানায়। দুর্গাদাস রেগে গিয়ে বলেন — আশ্রয় দিয়েছ ঘটা করে, খেতে দিতে পার না ? ও তো অসুস্থ।

— হ্যাঁ। কিন্তু আমার মা বৃদ্ধা — শরীরও খারাপ। তাঁর পক্ষে কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না।

— আশেপাশে আর কেউ নেই ?

সঙ্গে সঙ্গে রুক্মিণীর কথা মনে পড়ে। প্রতিশোধ নেবার লোভ হয় মনে মনে। বলে — একজন খুব কাজের মেয়ে আছে। কিন্তু তাকে করিমবক্সের কথা বলতেই সে রুখে উঠে বলে — আমি নাকি

বিশ্বাসঘাতক। তাই ভয়ে আর কাউকে বলতে পারি নি। পাছে তারা করিমবক্সকে মেরে ফেলে।

– তোমাকে বিশ্বাসঘাতক বলেছে? কে মেয়েটা?

– আমার জানাশোনা। বাড়ির কাছেই থাকে।

– হুঁ। খুব পাকা মেয়ে তো। নিয়ে চল সেখানে।

পৃথ্বী দুর্গাদাসকে নিয়ে যখন রুক্মিণীর বাড়িতে উপস্থিত হয় তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

পৃথ্বী বাতায়নের কাছ থেকে রুক্মিণীকে ডাকে। রুক্মিণী এসে দেখে পৃথ্বীর সঙ্গে আরও পাঁচজন অশ্বারোহী। সে ইতস্তত করে। তারপর ঘাড় বেঁকিয়ে বলে – ডাকছ কেন?

পৃথ্বী বুক ফুলিয়ে বলে – তোমার বিবেক কি বলল রুক্মিণী? আমি বিশ্বাসঘাতক?

কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তির সামনে পৃথ্বী তাকে এইভাবে অপদস্থ করায় রুক্মিণী খুব রুষ্ট হয়। সে প্রথমে ভাবে কথাই বলবে না। শেষে বলে – আমি এখনো চিন্তা করে দেখিনি। তবে আমার মনে হয় তুমি বিশ্বাসঘাতক। তুমি যতই সাক্ষী যোগাড় কর দুর্গাদাসও তোমাকে বিশ্বাসঘাতক বলবেন।

দুর্গাদাসের মুখে খুশীর হাসি ফুটে ওঠে। তিনি পৃথ্বীর সঙ্গে রুক্মিণীর সম্পর্ক সহজেই অনুমান করে ফেলেন।

ঘোড়া থেকে নেমে বলেন – একটু আমার কাছে এসো তো মা।

রুক্মিণী এসে বিশাল পুরুষটির সামনে মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে উদ্ধত ভঙ্গীতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

– বাঃ এ যে দেখছি সাচ্চা রাজপুতানী।

– আমাকে কি বলবেন, বলুন।

– আমি বলছি কি, পৃথ্বী মানুষের কাজ করেছে। একজন আহত আর অসুস্থ লোককে খুন করে সে দেশের কতটা উপকার করত জানি না, কিন্তু অমানুষ হয়ে যেত। তুমি কি চাও পৃথ্বী অমানুষ হোক?

—আমি জানি না। আমি জানি সবার আগে দেশ। দুর্গাদাসও তাই বলেন।

—ঠিক বলেছ। কিন্তু অমানুষ হয়ে মাতৃভূমির সেবা করা যায় না।

—কে বলেছে?

—দুর্গাদাসই বলেছেন।

—আপনি কি করে জানলেন? এইভাবে মুঘল সেনাকে লুকিয়ে রাখার কথা শুনেও তিনি একথা বলতেন?

—নিশ্চয়।

—আমি বিশ্বাস করি না।

—কি করলে বিশ্বাস করবে?

—তাঁর নিজের মুখে শুনলে। কিন্তু তা হবার নয়।

—কেন?

রুক্মিণীর কণ্ঠস্বর ব্যথায় আর সমবেদনায় ভরে ওঠে। সে বলে —তিনি কত ব্যস্ত। কোথায় পড়ে থাকেন ঠিক নেই। খাওয়ার সময় পান না। ঘুমোতেই পারেন না রোজ।

সেই সময় রুক্মিণীর বাবা হাতড়াতে হাতড়াতে এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলে—কাদের সঙ্গে এতক্ষণ বক্‌বক্‌ করছিস রুকি। কোথা থেকে এসেছে?

—জানি না। তুমি এলে কেন? পড়ে যাবে।

—যাই যাব। পৃথ্বী আছে?

—আছে। সেই তো সঙ্গে করে এনেছে। নিজে অন্যায় কাজ করে সাক্ষী যোগাড় করে এনেছে।

—কী অন্যায়?

—পরে শুনো।

দুর্গাদাস রুক্মিণীর বাবার দিকে চেয়ে বলে ওঠেন—খুব চিনি আপনাকে। কোথায় দেখেছি? কোথায় দেখেছি? দিল্লীতে?

—কে, কে আপনি ?

দুর্গাদাস বলেন—আত্মা সিং না ? চোখের এই অবস্থা হয়েছে জানতাম না তো ?

রুক্মিণী বিস্মিত। তার বাবাকে এই লোকটা চিনল কি করে ? তার বাবা দিল্লীতে ছিলেন—সে তো অনেক বছর আগে। সে তখন জন্মায় নি।

রুক্মিণীর বাবা বলে ওঠে—এ যে সেই কণ্ঠস্বর। কিন্তু আমার কুটিরে তা কি করে সম্ভব হবে ?

—আত্মা সিং, আমার কণ্ঠস্বর এখনো মনে রেখেছ ?

—দুর্গাদাস !

—হ্যাঁ আত্মা। তোমার মেয়ের কাছে এসেছি।

—আমার মেয়ে ?

—হ্যাঁ। কয়েক দিন ওকে এক মুঘলের জন্যে রান্না করে দিতে হবে।

—মুঘল ?

—হ্যাঁ। তোমার মেয়ের কাছে শুনো। আমি আজ যাই।

রুক্মিণী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। দুর্গাদাস তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। তার অবস্থা দেখে পৃথ্বী বিচলিত হয়। এর চেয়ে যেন রুক্মিণী তাকে বিশ্বাসঘাতক ভাবছিল সেটাই ভাল ছিল। তাকে এইভাবে ভেঙে পড়তে সে কখনো দেখেনি। এ বড় করুণ। সহ্য করা যায় না।

দুর্গাদাস বলেন—শান্ত হও মা। চোখের জল মুছে ফেল। অসুস্থ মানুষটার জন্যে পৃথ্বীকে দুবেলা কিছু রেঁধে দিও। এতে কোন অন্যায় হবে না। মুঘল হলে কি হবে, সে-ও তো মানুষ। দেশের জন্যে যুদ্ধ করা যেমন মানুষের কাজ, অসুস্থের সেবা করাও তারই কাজ।

দুর্গাদাস মুহূর্তের মধ্যে তাঁর অশ্বে আরোহণ করেন। অনুচরদের ইঙ্গিত করেই তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দেন। পৃথ্বী একলা দাঁড়িয়ে থাকে

রুক্মিণীর সামনে।

রুক্মিণীর বাবা কিছুক্ষণ বিহ্বল অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে বিড়বিড় করতে করতে ভেতর দিকে চলে যায়।

রুক্মিণীর থম্‌থমে মুখের দিকে চেয়ে পৃথ্বী কি বলবে ভেবে পায় না। আজ রাতেই আবার করিমবক্সের জন্যে খাবার দরকার।

শেষে মরিয়া হয়ে বলে ওঠে—কী মুশকিলে যে পড়লাম। আজ রাতেই আবার খাবার দরকার। সকালের সবটা খেয়ে ফেলেছে। দেখি কি করা যায়। অসুস্থ মানুষ কি শুক্‌নো চাপাটি চিবোতে পারবে?

রুক্মিণী চোখে ওড়না চাপা দিয়ে ছুটে ঘরে যেতে যেতে বলে ওঠে—আমি তৈরি করে রাখব।

আহারের পর জলটুকু নিঃশেষ করে করিমবক্স বলে—পাঁচদিন হয়ে গেল। বাকী রইল পাঁচদিন।

—হ্যাঁ। পা দেখছি বেশ ভাল হয়ে গিয়েছে। সামান্য যেটুকু ব্যথা রয়েছে অমন ব্যথা সব যোদ্ধার থাকে। যোদ্ধাদের দেহ কবে বেদনাহীন হয় করিমবক্স?

—যা বলেছ। আমার অসুবিধা হয়েছিল অসুস্থতার জন্য। প্রথম দুদিন তুমি অনেক কষ্টে খাবার সংগ্রহ করেছিলে জানি। কারণ এ কদিন সুন্দর খাবার দিচ্ছ। গোস্তও খাওয়াচ্ছ। কিন্তু একটা কথা বলে রাখছি পৃথ্বী সিং, এ সবের জন্যে কোনরকম বাধ্যবাধকতার মধ্যে থাকব না। আমাকে নিমকহারাম বলতে পারবে না।

—আমি তো গোড়াতেই বলেছি সেকথা। আবার যদি কখনো দেখা হয় আমাদের শত্রু হিসাবে ধরে নিও আমাকে।

—তবে একটা বিষয়ে কৃতজ্ঞ থাকব তোমার প্রতি।

একটু অবাক হয়ে পৃথ্বী প্রশ্ন করে—কোন্‌ বিষয়ে?

—তোমার দৌলতে দুর্গাদাসকে চাক্ষুষ দেখার সুযোগ পেলাম।

হেসে পৃথ্বী বলে — কি ধারণা হল দেখে ?

— আমার ধারণা শুনতে চাও ? না স্বয়ং দিল্লীর বাদশাহের মন্তব্য শুনবে ?

— তোমার ধারণাকে আমি কম মূল্য দেব না।

— আমি জানি দুর্গাদাসকে দিল্লীর বাদশাহ কল্পনাতীত সব প্রলোভন দেখিয়েছেন। তাকে বন্দী অথবা হত্যা করার জন্যে কোন প্রচেষ্টাই বাকী নেই। এমন একজন মানুষের চলাফেরা কিংবা মুখের রেখায় যে-ধরণের ছাপ দেখব আশা করেছিলাম, তেমন কিছুই দেখতে পেলাম না। ভেবেছিলাম তার মুখে থাকবে শৃগালের ধূর্ততা আর চলাফেরায় থাকবে চিতাবাঘের ক্ষিপ্রতা আর সতর্কতা। কিন্তু দেখলাম এত বয়সেও চেহারা সুন্দর, মুখ সরলতায় ভরা। চোখে যেন এক অপার্থিব জ্যোতি। বলতে পার তোমাদের দুর্গাদাস আমার শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছে। তবে আমি জানি, সে যে কল্পনাই করে থাকুক না কেন, একদিন বাদশাহের হাতে তাকে বন্দী হতেই হবে। তখন মৃত্যুই হবে একমাত্র পরিসমাপ্তি। তোমার পরিণতিও অন্য রকমের কিছু ভেবে বসে থেকোনা।

— ধন্যবাদ। তোমার মতামত শুনে আমার আনন্দ হল। তবে যেটুকু ভবিষ্যৎবাণী করেছ তাতে আমি ততটা গুরুত্ব দিই না। এবারে বাদশাহের মন্তব্য শুনি।

— হ্যাঁ। সেকথা শুনে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারবে। বাদশাহ ছবি অপছন্দ করেন। খাঁটি মুসলমানেরা তসবীরের ঘোর বিরোধী হয়। তবু তিনি দুখানা ছবি অনেক খরচ করে আঁকিয়েছেন শিল্পীদের দিয়ে। একটি ছবি শিবাজীর। তিনি বসে রয়েছেন। আর একটিতে তোমাদের দুর্গাদাস। অশ্বারূঢ় অবস্থায় দুর্গাদাস। তার হাতে বর্শা। সেই বর্শায় একটা রুটি গাঁথা রয়েছে। প্রজ্জ্বলিত আগুনে সেই রুটি ঝলসে নিচ্ছে দুর্গাদাস।

— অদ্ভুত তো। এভাবে সত্যিই তিনি রুটি সেঁকে নেন ঘোড়ার

পিঠে চেপে।

—বাদশাহ সব খবরই রাখেন। তিনি দুটি ছবি পাশাপাশি রেখে দিয়েছেন। একদিন ছবিতে শিবাজীকে দেখিয়ে বলেছিলেন, এ মানুষটিকে সামলানো সম্ভব; কিন্তু ওই রুটিওয়ালা বড় সাংঘাতিক। শেষ পর্যন্ত ও আমার সর্বনাশ না করে ছাড়ে।

—বাঃ সুন্দর। আত্মপ্রসাদ লাভ করার মতই মন্তব্য বটে। এতদিনে বুঝলাম তুমি শুধু দক্ষ সেনানায়ক নও, তুমি বাদশাহের অত্যন্ত কাছের মানুষ।

—তুমি বুদ্ধিমান পৃথ্বী। তবে তোমার এই যত্নের প্রতিদান হিসাবে আমার কিছু বলা উচিত, তাই বললাম।

—ধন্যবাদ। এবারে তুমি বিশ্রাম কর। আমি চলি।

পৃথ্বী সিং খাবারের পাত্র নিয়ে রুক্মিণীর বাড়ির দিকে যায়। রুক্মিণী তাকে রোজই সযত্নে খাবার তৈরি করে দেয়। কিন্তু তেমন কথা বলে না। পৃথ্বীও নিজে থেকে কিছু বলে না। রুক্মিণী হয়ত দুর্গাদাসের অভিমত মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারে নি।

দূর আকাশে পাহাড়ের গায়ে শকুন উড়ছে চক্রাকারে। ওরা ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে আসছে। কোন মানুষ কিংবা অশ্বের শবের সন্ধান পেয়েছে নিশ্চয়। ওদের আজকাল বড় বেশী দেখা যায়।

রুক্মিণী তার বাড়ির পাশের শিমূল গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল। পৃথ্বী তার হাতে পাত্র দিয়ে বলে,—তোমার অসুবিধা হলে আমি মাকে বলতে পারি।

—না।

পৃথ্বী চলে আসছিল। একটু এগিয়ে যেতেই সে পেছনে রুক্মিণীর ডাক শোনে। পৃথ্বী পেছন ফিরে দেখে তার দিকে চেয়ে রয়েছে রুক্মিণী।

কাছে গিয়ে দাঁড়ায় সে। রুক্মিণী তার পায়ের আঙুল দিয়ে মাটিতে গর্ত করার চেষ্টা করতে থাকে।

— কিছু বলবে ?

রুক্মিণীর পায়ের আঙুল থেমে যায়। সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পরে ওর সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে থাকে। পৃথ্বী ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি দুহাত দিয়ে চেপে ধরে ওকে। কাঁদতে কাঁদতে রুক্মিণী ওর গায়ের ওপর ভেঙে পড়ে।

— এমন করছ কেন রুক্মিণী ? শরীর খারাপ হয়েছে ?

— না।

— তবে ?

— আমি ভুল করেছিলাম।

— কী ভুল করলে ?

— তোমাকে কষ্ট দিয়েছিলাম। আমার বুদ্ধি নেই।

— তোমার বুদ্ধি নেই ? পৃথিবীর একটা মানুষও একথা বিশ্বাস করবে না। দুর্গাদাসই করেন নি। তোমার মত বুদ্ধি কার আছে ?

— না। তুমি আমাকে ভোলাচ্ছ।

— আমি ? তাহলে আবার দুর্গাদাসকে আনতে হয়।

— না। তুমি তাঁকে শিখিয়ে দেবে।

— আমি ? আমার কাঁধে কয়টা মাথা আছে ?

— তুমি আমাকে বোকা ভাব।

— আমি ? তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে তো একটাও দেখলাম না এপর্যন্ত। কত মেয়ে দেখলাম। সবাই হেরে গেল তোমার কাছে। তাই তো কারও দিকে তাকানোই ছেড়ে দিয়েছি। ধুৎ, সব বাজে।

— আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছ। মনে মনে হাসছ।

— আমি ? আমি মনে মনে এই কয়দিন শুধু কাঁদছিলাম। আজ বোধহয় হাসব মনে হচ্ছে।

— না, আমি বোকা। তুমি জান সে কথা।

— সত্যি না। এই তো তোমাকে ছুঁয়ে বলছি। তোমাকে ছুঁয়ে আমি কখনো মিথ্যা বলতে পারি রুক্মিণী ?

—না। পারো না।

—তবে ?

—তাহলে যে তুমি আগের মত কথা বলো না ?

—তোমার মুখ যেরকম গম্ভীর দেখি। আমার জন্যে খাটতে হচ্ছে শুধু শুধু। তাই ভয়ে কথা বলি না।

—যাঃ।

—সত্যি।

—এটাও আমাকে ছুঁয়ে বলছ ?

—ছুঁয়েই তো রয়েছি।

—তুমি আমাকে ভয় পাও ?

পৃথ্বী ভ্রূ কুঁচকে গম্ভীর স্বরে বলে—পাবো না ? তোমাকে ভয় না পেলে তো আমার জগতই মিথ্যে।

—ইস্, কী যা তা বলছো।

পৃথ্বী সিং হেসে ওঠে।

একটু পরে রুক্মিণী বলে—তোমার মুঘল বন্ধু আমার তৈরী খাবার খেতে পারে তো ?

—পারে না মানে ? এই তো আজই বলছিল, দারুণ ভাল লেগেছে।

—এবারে মিথ্যা বললে। আমাকে তো এখন ছুঁয়ে নেই, তাই।

—এই ছুঁয়ে বললাম। হলতো ?

—মুঘল খানার কাছে এই খাদ্য ?

—যুদ্ধ করতে এসে মুঘল খানা পাওয়া সহজ নাকি ? ওসব দিল্লীতে কালেভদ্রে খেতে পারে। প্রতিদিন ওরা এমন কিছু খেতে পায় না। কত সময় হয়ত ওদের আধপেটা খেয়েও থাকতে হয়। আমরা প্রায়ই ওদের রসদ লুঠপাট করে নিই।

—আচ্ছা, ওকে আর কতদিন আটকে রাখবে ?

- দেখি। দুর্গাদাসই হয়ত আদেশ দেবেন।

—ওকে ছেড়ে দিলে তো আবার আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।

—করবে বৈকি। আমাদের ওরা বন্দী করে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলে কি করতাম ?

—ওরা ছেড়ে দেয় কখনো ?

—নিশ্চয় দেয়।

—জান, আমি দুর্গাদাসকে স্বপ্নে দেখি।

—বাঃ, খুব ভালই তো। ওঁকে স্বপ্নে দেখাও পুণ্য।

—তোমার জন্যে ওঁর দেখা পেলাম নিজের বাড়িতে।

—আমার জন্যে কেন ? তোমার জন্যে বল।

রুক্মিণী লজ্জা পায়। সে পৃথ্বীকে নানা কথা বলে আটকে রাখতে চায়। অথচ পৃথ্বী চঞ্চল হয়ে উঠেছে। নিশ্চয় কোন কাজ আছে। সে কষ্ট পাবে ভেবে বলতে পারছে না। যেতেও পারছে না। অথচ এই পৃথ্বীকে সে কী না বলেছে। রুক্মিণীর চোখ আবার ছল্‌ছল্‌ করে ওঠে।

শিমূল গাছের ডালে একটা ঘুঘু সমানে ডেকে চলেছে। রুক্মিণী সেই দিকে মুখ ফেরাবার চেষ্টা করে। কিন্তু পৃথ্বী দেখে ফেলে।

সে বলে—তোমার চোখে আবার জল রুক্মিণী ?

—না। এমনিতে। আচ্ছা, দুর্গাদাস আমাকে কি ভাবলেন বল তো ?

—খুব প্রশংসা করেছেন তোমার। আর কি বললেন জানো ?

—কি ?

—উনি কিন্তু সব বুঝতে পেরেছেন।

—কি ?

—বলতো কি ?

—রুক্মিণী ভেবে উঠতে পারে না।

পৃথ্বী বলল—উনি বললেন, তোমার ভাগ্য ভাল পৃথ্বী। বাড়ির পাশেই একটি রত্ন পেয়ে গিয়েছ।

— মিথ্যেবাদী। একথা বলতেই পারেন না।

— ঠিক আছে। পরে যেদিন উনি আসবেন, ওঁর মুখেই শুনো। উনি তোমার বাবার কথা বললেন। উনি জানতেন না, তিনি কোথায় আছেন। দেখা হবার পর সব কথা মনে পড়েছে। তোমার বাবা অত্যন্ত বিশ্বাসী আর নির্ভরযোগ্য ছিলেন। দিল্লীতে অনেকদিন তিনি দুর্গাদাসের সঙ্গে ছিলেন।

রুক্মিণীর ভেতরটা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। আর সেই সময় অদূরে বাঁকের মুখে দেখতে পায় এক গেরুয়াধারীকে।

— ওই দেখ, কে আসছেন। আমি পালাই।

রুক্মিণী ছুটে বাড়ির ভেতরে চলে যায়।

পৃথ্বী দেখতে পায় সেই সন্ন্যাসীকে। বিস্মিত হয়। যাঁকে এর আগে জীবনে কখনো দেখেনি, তাঁকে এত ঘনঘন এই গাঁয়ের আশেপাশে কেন দেখা যাচ্ছে? এই সন্ন্যাসী সাধারণ কেউ নন, একথা প্রমাণিত। কারণ দুর্গাদাসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

সন্ন্যাসী কাছে এসে স্মিত হেসে বলেন— মেয়েটি আমাকে দেখে পালালো কেন?

— আপনি ওকে চেনেন?

— তুমিই তো বলেছিলে। ওর রাগ পড়লো?

— হ্যাঁ। ও এখন খুব লজ্জিত।

— মেয়েটি বড় ভাল।

— কি করে বুঝলেন?

— দুর্গাদাস বলেছে।

— তাঁর সঙ্গে আপনার কি সব সময়ই দেখা হয়?

— তা প্রায় হয় বৈকি।

— আপনি কে?

— কেন? সন্ন্যাসী।

— জানি। কিন্তু তাছাড়া?

– বলতে পারো, একজন দেশপ্রেমিক।

– না, আপনি এমন একজন যাঁকে দুর্গাদাস শ্রদ্ধা করেন, বিশ্বাস করেন।

– ও সব কথা থাক। শোন, এবারে তোমার মুঘল বন্ধুটিকে মুক্তি দিয়ে দাও।

– কোথায় ?

– যোধপুরের পথে কোথাও। ও চলে যাক।

– কিন্তু দুর্গাদাস ? তাঁর অনুমতি প্রয়োজন।

– অনুমতি আছে তার। সেইজন্যেই বলছি।

পৃথ্বীর মনে দ্বিধা।

– শোন পৃথ্বী সিং। আমাকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই তোমার। তুমি চলে যাও তোমার নন্দিনীর কাছে। সেখানে দেখবে তার একটা নতুন সঙ্গী জুটেছে। তবে একটু বয়স্ক। যোধপুর অবধি কোনরকমে চলে যেতে পারবে। না গেলেও ক্ষতি নেই। পথে অন্য ঘোড়া জুটে যাবে।

– নন্দিনীর ওখানকার ঘোড়াটা কে আনল ?

– অত প্রশ্ন করো না।

– কিন্তু করিমবক্স তো ফিরে গিয়েই সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসবে।

– না। যোধপুরে এখন অত সৈন্য নেই। বাদশাহ নিজে আজমীঢ়ে এসে রয়েছেন। চারদিকে একটা অস্থির ভাব। তোমাকে সব কথা ব্যাখ্যা করে বলার সময় নেই। তবে এরপর থেকে তোমরা বিশ্রামের সময় খুব কমই পাবে। সমস্ত শিশোদীয় আর রাঠোরেরাই বিশ্রামের অবকাশ পাবে না।

– মুঘল বন্দীকে নিয়ে কখন রওনা হব ?

– অপরাহ্নে। যাতে কিছুটা দূর পৌঁছোতেই সন্ধ্যা হয়ে যায়। সেই সময় তুমি চলে আসবে। হ্যাঁ ভাল কথা। তোমার সঙ্গী হিসাবে তেজ সিংও যাবে তোমার সঙ্গে।

— তেজ সিং ? কোন্ তেজ সিং ?

— দুর্গাদাসের ছেলে। বয়সে কিশোর হলেও তাকে কম ভেবো না।

পৃথ্বীর সমস্ত দ্বিধা মুহূর্তে কেটে যায়। সে খুব উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। দুর্গাদাস তাকে এতটা নির্ভর করেন ?

— তেজ সিংকে আমি কোথায় পাব ?

— নন্দিনীর কাছেই। তবে এখনো সে এসে পৌঁছোয় নি।

সন্ন্যাসী আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে দ্রুত চলে যান।

তেজ সিংকে কখনো দেখেনি পৃথ্বী। সে-ও তাহলে তাদের গাঁয়ের খুব কাছাকাছি রয়েছে। এতক্ষণে বুঝতে পারে পৃথ্বী, দুর্গাদাস তাঁর ঘাঁটি অন্তত: কিছুদিনের জন্য তাদের গাঁয়ের কাছাকাছি কোথাও করেছেন। তাই তিনি কয়েক প্রহরের মধ্যে এসে দেখা দিতে পারেন। তাই তেজ সিং এত তাড়াতাড়ি এসে উপস্থিত হতে পারবে। আর সেইজন্যেই সন্ন্যাসীর এত ঘন ঘন আবির্ভাব। দুর্গাদাসকে ঘিরে তিনি সম্ভবত কোন নিরাপত্তার বেষ্টনী রচনা করে রাখেন তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতার বলে।

তেজ সিংকে দেখে পৃথ্বী সিং সন্তুষ্ট হয়। হ্যাঁ, দুর্গাদাসের পুত্রই বটে। মুখের কমনীয়তা পুরোপুরি রয়েছে। গোঁফের রেখা একটু একটু দেখা যায় কি না যায়। অথচ শরীর ঋজু। দুই বাহু বলিষ্ঠ।

— তুমিই পৃথ্বী সিং ?

— হ্যাঁ।

— আমি তেজ সিং।

— জানি।

— কোথায় যেতে হবে ?

— আমার সঙ্গে চল। আমাদের গাঁয়ের পাশে। এই বুড়ো ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমরা ছুটতে পারব না।

— জানি।

ওরা রওনা হয়। কারণ সূর্য ইতিমধ্যেই অনেকটা নীচে নেমে গিয়েছে। কিছুদূর চলতে চলতে দু-একটা কথার আদান প্রদান হয়। পৃথ্বী লক্ষ্য করে তেজ সিং বিনয়ী হলেও, মাঝে মাঝে একটা উগ্রতা প্রকাশ পায় তার কথার মধ্যে। বোধহয় অল্প বয়সে এমন হয়। এত কম বয়সেই দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে করতে এমন হয়েছে হয়ত।

এক সময় পৃথ্বী প্রশ্ন করে — ওই সন্ন্যাসী কে?

— আমি জানতাম, এই প্রশ্ন করবে তুমি। উনিই বলে দিয়েছিলেন আমাকে। উনি হলেন বাবার গুরুদেব। বয়স কত কম মনে হয়। আসলে অনেক বয়স। বাবার চেয়ে ঢের বড়।

— সত্যি?

— হ্যাঁ। কিন্তু বেশীদিন বোধহয় থাকবেন না এবারে। কেদার-বদ্রীর দিকে রওনা হবার ইচ্ছে আছে। উনি কিন্তু খুব উঁচুদরের অশ্বারোহী। আমার শিক্ষাদাতা।

— এই বুড়ো ঘোড়াটাকে তাহলে উনিই এনেছেন?

— হ্যাঁ। বাবা একটা ভাল ঘোড়া দিতে চেয়েছিলেন। উনি এটি বেছে নিলেন।

কথা বলতে বলতে একসময় ওরা করিমবক্সের কুটিরের সামনে এসে উপস্থিত হয়। পৃথ্বী দেখে করিমবক্স একটা পাথরের ওপর বসে রয়েছে। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে সে কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন। পৃথ্বী তাকে চেঁচিয়ে ডাকে। সেই ডাকে সারা দিয়ে সে মুখ ফেরালো, কিন্তু তাতে কোনরকম উৎসাহ নেই।

তেজ সিং কোন মুঘল সেনাকে এত কাছ থেকে এই প্রথম দেখল। তাই তার চোখে-মুখে তীব্র কৌতূহল। তার ধারণা ছিল মুঘলদের চেহারায় হিংস্রতা ফুটে ওঠে। কিন্তু করিমবক্সকে দেখে ধারণাটা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। দেখল, তাদেরই মত একজন মানুষ সে। মুখশ্রী

সুন্দর, তবে কেমন যেন ফ্যাকাশে। আর সারা মুখে বিষণ্নতা।

পৃথ্বী বলে—তোমাকে নিতে এলাম করিমবক্স।

—কেন? দশদিন তো শেষ হয়নি।

—তাতে কি? আগে থাকতেই সাবধান হওয়া ভাল। দশদিন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে যদি পালিয়ে যাও।

করিসবক্স মৃদু হেসে বলে—তাও বটে।

—ঘোড়ায় চাপতে পারবে? ব্যথা কমেছে নিশ্চয়।

—কোথায় নিয়ে যাবে? বেশ তো ছিলাম।

—অত প্রশ্ন কর কেন? বন্দীর অত প্রশ্ন করা শোভা পায়?

—ঠিক। এই ঝিমোনো ঘোড়াটা বুঝি আমার জন্যে? পড়ে যাবে না তো?

—না। কাজ চলে যাবে। উঠে পড় দেখি। হাতে বেশী সময় নেই।

পৃথ্বী লক্ষ্য করে করিমবক্সের পায়ের ফোলা এখনো একটু রয়েছে। তবে চলতে বিশেষ অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না।

আর একটিও প্রশ্ন না করে করিমবক্স ঘোড়ায় চাপে।

—এবারে চল। তুমি মাঝেখানে, সামনে আমি আর পেছনে তেজ সিং।

করিমবক্স এদিকের পথঘাট আদৌ চেনে না। তাই বুঝতে পারে না তাকে নিয়ে যোধপুরের দিকে রওনা হয়েছে পৃথ্বী। তার ধারণা হল, দশ দিন শেষ হবার আগে কোন সুরক্ষিত স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে।

পৃথ্বী পেছন ফিরে বলে,—একটু জোরে চলতে হবে করিম। খানিক পরেই সন্ধ্যা নেমে যাবে।

—আমার আপত্তি নেই। বাহনটা সহ্য করতে পারবে তো•

—চেষ্টা করতে ক্ষতি কি?

—বেশ চল।

করিমবক্স অবাক হয়ে লক্ষ্য করে বুড়ো ঘোড়া দিব্যি চলেছে নন্দিনীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে। একসময় নিশ্চয় খুব তেজী ছিল। অতীত দিনের অভ্যাসবশেই চলতে পারছে। নইলে এভাবে চলা সম্ভব হতো না।

– চমৎকার করিমবক্স।

– আমি নই। তোমার এই বুড়োর হাড়ে ভেল্‌কি খেলছে। তবে আর বেশীক্ষণ বোধহয় নয়। বেদম হয়ে পড়বে।

– আর অত জোরে ছোটার প্রয়োজন নেই। এবারে আস্তে আস্তে চলতে পারো।

আরও কিছুদূর ওরা এগিয়ে যায়। সন্ধ্যা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। একটা ছোট্ট পাহাড়ের পাশে এসে থামে ওরা।

পৃথ্বী সিং বলে – আকাশে চাঁদ নেই। বেশ অন্ধকার। তোমার অসুবিধা হচ্ছে করিমবক্স ?

হাসি ফুটে ওঠে করিমবক্সের মুখে। সে জানে পৃথ্বী তামাসা করছে। নইলে অশ্বারোহীদের কত বেশী অন্ধকারে, কত দুর্যোগপূর্ণ রাত্রে দূরের পথে পাড়ি দিতে হয় একথা তার অজানা নয়।

– অন্ধকারের জন্য বলছ পৃথ্বী ?

– শুধু অন্ধকার নয়। তোমার পা জখম।

– পায়ের কথা আমার এতক্ষণে মনে পড়ল। একটুও বুঝতে পারিনি।

তেজ সিং ওদের পরস্পরের বাক্যালাপ শুনে স্তম্ভিত হয়। ঠিক যেন দুই বন্ধু অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করে চলেছে। পিতাকে গিয়ে বলবে সে। মুঘলদের সঙ্গে এভাবে কথা বলা উচিত কিনা সে জানেনা।

পৃথ্বী দাঁড়িয়ে পড়ে। করিমবক্সকে পাশে এনে সামনের দিকটা দেখিয়ে বলে – এই যে রাস্তা চলে গিয়েছে এটা শেষ হবে যোধপুরে।

চমকে ওঠে করিমবক্স। আফশোষ হয়, তার চুক্তির মেয়াদ শেষ

হয়নি। দুঃখ হয়, তার অশ্বটি খুবই দুর্বল। কষ্ট হয়, সে নিরস্ত্র। তবু ঘোড়াটি ভাল হলে সে হয়ত প্রলোভন সামলাতে পারত না। হয়ত ছুটে চলে যেত এদের নাগালের বাইরে। কিন্তু যেতো কি শেষ পর্যন্ত? বোধহয় না। পৃথ্বীর কাছে জবান দিয়েছে। খেলাপ করা দুঃসাধ্য হত।

পৃথ্বী বলে—তোমাকে যদি এখানে একলা রেখে আমরা চলে যাই, তুমি নিশ্চয় যোধপুরে গিয়ে পৌঁছোতে পারবে?

—ঠাট্টার দরকার কি? আমি চুক্তিবদ্ধ। যেখানে নিয়ে যাচ্ছ, সেখানেই চলো।

পৃথ্বী তেজ সিংকে নিজের পাশে নিয়ে আসে। তারপর কোমর থেকে একটা ছুরি বার করে। করিম সেইটি দেখে অবাক চোখে পৃথ্বীর দিকে চায়। এই নির্জনে পৃথ্বী ছুরি বার করেছে! পাশে তেজ সিং! সে একা মুঘল। কিন্তু ওরা তো রাজপুত। ওরা কি এভাবে গুপ্ত হত্যা করে? দুর্গাদাস নিজেও তো এমন আভাস দেয়নি।

পৃথ্বী ছোরাটি করিমবক্সের দিকে এগিয়ে ধরে বলে—এই নাও। তলোয়ার দিতে পারি না। এইটি নিয়ে তুমি কিছুটা আত্মরক্ষা করতে পারবে। তোমার তলোয়ার না ভেঙে গেলে, সেটি দিতে পারতাম।

ছোরাটা হাতে নিয়ে করিমবক্স বলেন—এ সবের অর্থ কি?

—তুমি মুক্ত করিমবক্স। যোধপুরে ফিরে যাও।

—আমাকে কি তোমরা পেছন থেকে হত্যা করবে?

পৃথ্বী ইঙ্গিতে তেজ সিংকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে বলে, নিজেও তাকে অনুসরণ করে। তাদের অশ্বখুরধ্বনি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে শেষে একেবারে মিলিয়ে যায়।

বিহ্বল করিমবক্স অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। অদ্ভুত এই রাজপুতরা। এদের মধ্যে সব আছে, অথচ বাস্তব জগতে কেমন যেন অসঙ্গতিপূর্ণ।

সে বলে ওঠে—চল্ বুড়ো। যোধপুরেই যাই। অনেকটা পথ কিন্তু। যদি না পারিস সোজাত অবধি চল্। তারপর দেখা যাবে।

•

দুর্গাদাস যেমন যশোবন্ত সিংএর পুত্র অজিত সিংকে মাড়োয়ারের সিংহাসনে বসাবার জন্য রাঠোর জাতিকে প্রস্তুত করছেন, তেমনি মেবারও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে নেই। মেবারের মহারাণা বৃদ্ধ রাজসিংহ জানেন, দিল্লীর বাদশাহ বহুদিন থেকেই সমগ্র রাজপুত জাতিকে ধ্বংস করার চেষ্টায় আছেন। তারই ফলে চিতোর আর উদয়পুর আজ হাতছাড়া। দুর্গাদাসের মত তাঁকেও লড়তে হচ্ছে অনেক অসুবিধার মধ্যে থেকে। তাঁর ভাগ্য ভাল, তাঁর দুই পুত্র জয়সিংহ আর ভীম সিংহ—তারাও পিতার আশাকে উজ্জ্বল রাখতে ব্রতী। রাজসিংহ বুঝেছেন মাড়োয়ারের দুর্গাদাসের মত পুরুষ অদূর ভবিষ্যতে আর জন্মাবে না। একথাও জানেন আওরঙজেব মেবার আর মাড়োয়ারকে সম্পূর্ণরূপে করতলগত করার আশু উপায় খুঁজছেন। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে শিশোদীয় আর রাঠোরের মিলিত শক্তি নিয়ে লড়াই করাই শ্রেয়। তাতে আওরঙজেবকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করা সম্ভব হবে। প্রথমে এ-ব্যাপারে তাঁর সামান্য দ্বিধাভাব ছিল। কিন্তু অজিত সিংহ-এর মাতা যখন রাজসিংহকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তিনি রাঠোর-গৃহিণী হলেও তিনি মেবার-কন্যা, সুতরাং মেবারের উচিত রাঠোরের শক্তি বৃদ্ধি করা, তখন সমস্ত দ্বিধা ফুৎকারে মিলিয়ে গেল।

রাজসিংহ লক্ষ্য করেছিলেন, যে প্রথমে বাদশাহ তাঁর প্রিয়তম চতুর্থ পুত্র আকবরকে চিতোরের ভার দিয়েছিলেন। কিন্তু মেবার সৈন্যদের ঘনঘন আক্রমণে আকবরের শক্তি ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। এমনকি একদিন শিশোদীয় সেনারা চিতোর-সংলগ্ন বাদশাহজাদার শিবিরে আক্রমণ চালিয়ে অনেককে হতাহত করে

চলে যায়। এতে মুঘল সৈন্যদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয়। তারা আর কিছুতেই কোন উপত্যকা কিংবা গিরিপথের দিকে মুষ্টিমেয় দলে যেতে চাইল না। এই সুযোগে মহারাণা নিজে একদিন সৈন্য পরিচালনা করে মুঘল ফৌজকে পরাস্ত করেন। এতে বাদশাহ ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। সঙ্গে সঙ্গে আজমীঢ়ে বসে তিনি ফতোয়া জারি করলেন যে বাদশাহজাদা আকবরের কাছ থেকে বাদশাহজাদা আজম চিতোরের ভার নিক। আর আকবর মাড়োয়ারের ব্যবস্থা করুক। কারণ বাদশাহ উপলব্ধি করেছেন, আগে মেবারকে পর্যুদস্ত না করলে রাঠোরদের কিছুতেই বাগে আনা সম্ভব হবে না। ঠিক হল, মেবারের দিকে ত্রিমুখী আক্রমণ পরিচালিত করতে হবে। পূর্বদিক অর্থাৎ চিতোরের দিক থেকে আজম এগিয়ে আসবে দেওবাড়ি গিরিপথ আর উদয়পুর হয়ে। উত্তর দিক থেকে মোয়াজ্জাম আসবে রাজসমুদ্র হ্রদের পাশ কাটিয়ে আর পশ্চিম অর্থাৎ মাড়োয়ারের দিক থেকে দেওসুরী গিরিপথ ধরে এগিয়ে আসবে আকবর। তিন বাদশাহজাদার একত্রিত অভিযান।

কিন্তু কিছুই হল না। আজম বা মোয়াজ্জাম কেউ সফল হল না। এদিকে আকবর সোজাত অবধি এসে সেখানে শিবির স্থাপন করে আলস্যে বিলাসে গা ভাসিয়ে দিল। আকবরের প্রতি আওরঙজেবের স্নেহ সর্বাধিক হলেও তিনি অন্ধ ছিলেন না। পুত্রের দুর্বলতার কথা তাঁর ভালই জানা ছিল। তাতে কোন ক্ষতি ছিল না। কারণ পুত্রের দুর্বলতার দিকটা তিনি ঢেকে রাখার চেষ্টা করতেন। কিন্তু ক্ষতি হল এই দুর্বলতার কথা আর একজন জানতে পারায়। তিনি পরাক্রমে দিল্লীর বাদশাহের সমতুল্য না হলেও রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় কম নন। তিনি হলেন মেবারের মহারাণা রাজসিংহ। আকবরের চরিত্র তিনি জেনে ফেলেছিলেন বলেই ভারতের ঐতিহাসিক ভাগ্যাকাশে এক প্রবল ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল, যার মধ্যে অল্পের জন্য বাদশাহ নিজে গিয়ে পড়েন নি। পড়লে ইতিহাসের গতি ভিন্নমুখী হবার

যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

কিন্তু ইতিহাস থাক। পটভূমিকা হিসাবে এটুকু উল্লেখের প্রয়োজন ছিল মাত্র।

দুর্গাদাস আরাবল্লীতে তাঁর ঘাঁটি সরিয়ে নেবার জন্য প্রস্তুত হন। খবর এসেছে বাদশাহ আজমীঢ়ে বসে যুদ্ধ কৌশল স্থির করে ফেলেছেন। রাজসিংহকে পরাজিত করতে না পেরে তিনি ক্ষিপ্ত। তাই তিনি প্রথমেই রাঠোরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন আকবরকে।

তেজ সিংএর সঙ্গে ইতিমধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে পৃথ্বী সিং-এর। তার তারুণ্য, তার উদ্যম তার শৌর্যে সে আকৃষ্ট। সেই তেজ সিং একদিন পৃথ্বীর বাড়ির সামনে এসে যখন দাঁড়ালো তখন মধ্যাহ্ন। শিমূল গাছের সব ফুল ইতিমধ্যে কবে শুকিয়ে ঝরে পড়ে গিয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। গাছ থেকে তুলো উড়ে উড়ে কতদিন হল দিগন্তে মিলিয়ে গিয়েছে। একটুও খেয়াল করেনি পৃথ্বী। কোনদিকে চেয়ে দেখার এতটুকু অবকাশ হয় না তার। কোকিলেরা গাছের ডালে বসে ডেকে ডেকে গলা ভেঙে ফেলে পরের বসন্তের জন্য বিষণ্ন মনে বিদায় নিয়েছে। পৃথ্বী জানেনা।

বাড়িতে বসে ছিল পৃথ্বী সিং। মাঝে মাঝে করিমবক্সের কথা এখনো মনে হয় তার। ভাবছিল করিমবক্স ফিরে গিয়ে মুঘল শিবিরে যে বিস্ময় আর চমক সৃষ্টি করেছিল, এতদিনে সে সব পুরোনো হয়ে গিয়েছে। করিম বিশ্বস্ত মুঘল হিসাবে নিজের কাজ করছে।

আরও অনেক কথাই ভাবছিল পৃথ্বী। সেই সময় তেজ সিংএর আবির্ভাব। গা বেয়ে ঘাম ঝরছিল তার।

বলে—বাবা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। খুব জরুরী।

—কখন যাব?

—তোমার কখন সুবিধে হবে?

– আমার সুবিধের কথা ওঠে না। উনি যদি চান এক্ষুনি যাব।

– তাহলে ভালই হয়। তবে প্রস্তুত হয়ে যেও। কিছুদিনের মধ্যে গ্রামে ফিরতে পারবে না। আমি চলি।

– একটু বিশ্রাম করে যাও। তোমাকে ক্লান্ত মনে হচ্ছে।

উদ্ভাসিত মুখে তেজ সিং বলে – এই ক্লান্তিতেও এক অপূর্ব আনন্দের আস্বাদন পাওয়া যায়। তাই না পৃথ্বী সিং ?

পৃথ্বী হেসে বলে – ঠিক বলেছ।

তেজ সিং অপেক্ষা করে না।

একটু পরেই প্রস্তুত হয়ে পৃথ্বী মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

– কিরে ? এই বেশে ? নিশ্চয় বাইরে যাবি ?

– হ্যাঁ মা। দুর্গাদাস ডেকে পাঠিয়েছেন। বেশ কিছুদিনের জন্যে যেতে হবে। তাই প্রণাম করতে এলাম।

– যুদ্ধে যাচ্ছিস ?

– ঠিক জানি না। তবে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে হয়।

– আমাকে দেখবে কে ?

– কেন ? অমর ? তাকে তো গাঁয়ের কর্তা করে দেওয়া হয়েছে। বুক ফুলিয়ে সেকথা বলে বেড়াচ্ছে সে।

মা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। ঝর্ণার ধারে তাঁর একমাত্র পুত্রটি জন্মেছিল। তারপর কয়দিনই বা তার বাবা বেঁচে ছিলেন। একাই তো মানুষ করে তুলতে হয়েছে। গাঁয়ের লোকেরাই দেখাশোনা করে এসেছে বরাবর। এখন পৃথ্বী বিদায় নিলে, নতুন করে কোন অসুবিধা কিছু হবে না। একা থাকতে হবে এইখানে। কিন্তু আজ যেভাবে সামনে এসে দাঁড়ালো, তাতে বুকের ভেতরে ছ্যাঁৎ করে উঠল। ঠিক এমনি ভাবেই বলা নেই কওয়া নেই আর একজন তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বলেছিলেন, দুর্গাদাস ডাকছেন। সে প্রায় আঠারো বছর আগের কথা।

পৃথ্বী মায়ের পায়ের কাছে মাথা রেখে প্রণাম করে। মা তার

মাথায় চুমু খান।

—শুধু মাথায় নয় মা। এই তলোয়ারকেও চুমু দাও। এ তোমার সন্তানকে বাঁচাবে।

মা তলোয়ারকে চুমু খেয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেন—একে তো সেবারেও চুমু খেয়েছিলাম।

—হ্যাঁ মা। সেইজন্যেই তো বলছি। তাঁর গর্বে আমি গর্বিত। তিনি প্রাণ দিলেন। কিন্তু তলোয়ারটি তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে একজনকেও জীবিত রাখলেন না। একি কম কথা! আমি যেন বাবার মত হই।

দৃঢ় কণ্ঠে মা বলেন—হ্যাঁ, তার মত হোস।

মাতা-পুত্রের বিদায়-লগ্নের এই গম্ভীর পরিবেশ মুহূর্তে খান্‌খান্‌ হয়ে গেল অমর সিং-এর চিৎকারে।

—পৃথ্বী, এই পৃথ্বী। বাড়ি আছিস?

বাইরে বার হয়ে এসে পৃথ্বী দেখে অশ্বারূঢ় অমর সিং-এর চোখ মুখ উৎসাহে আনন্দে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। তার ঘোড়ার পেছনে বাঁধা রয়েছে মস্ত একটা মৃত হরিণ। শিকার করে এনেছে সে।

—দেখ্‌ছিস্‌? ওঃ খুব ভুগিয়েছে। আমিও ছেড়ে দেবার পাত্র নই। শেষ পর্যন্ত—দেখতেই পাচ্ছিস।

—বাঃ একটা কাজের কাজ করেছিস বটে। গাঁয়ের লোকে অনেকদিন পরে পেট ভরে একটু মাংস খেতে পাবে।

ঘোড়া থেকে নেমে হরিণের বাঁধন খুলতে গিয়ে অমর বলে—কতবড় দায়িত্ব আমার ওপর চাপিয়েছিস তোরা। পালন করতেই হবে। একটু হাত লাগা তো। নামিয়ে ফেলি। তোর বাড়িতেই কাটাকুটি শেষ করব।

—না অমর। আমাকে এই মুহূর্তে চলে যেতে হচ্ছে।

অবাক অমর সিং কিছুক্ষণ হাঁ করে থেকে বলে—চলে যেতে হচ্ছে? কোথায়?

— তলব এসে গিয়েছে।

— বেশ তো। খেয়ে দেয়ে পরে যাস্।

— না ভাই। জরুরী তলব। এখুনি রওনা দিতে হবে।

অমর সিং-এর মুখ মলিন হয়ে যায়। বড় উৎসাহ নিয়ে এসেছিল। দুঃখের মত সুখের মুহূর্তগুলোও পৃথ্বীর সঙ্গে ভাগ করে নিতে না পারলে, কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে তার। কিন্তু আজ সে পৃথ্বীকে আটকাতে পারবে না জানে। তাই হরিণটাতে আর হাত দেয় না।

পৃথ্বী তার কাঁধে হাত রেখে বলে — তেমন দিন এলে তোর সঙ্গে আগের মত শিকারে যাব। কিন্তু এবারে বোধহয় কিছুদিন বাইরে থাকতে হবে। মাকে দেখিস।

— সে কথা বলতে হবে নাকি?

— না। মায়ের জন্যে কষ্ট হয় কিনা?

— জানি। রুক্মিণীর সঙ্গে দেখা করেছিস?

— না। যাবার পথে দেখা করব।

অমর সিং হরিণটার গায়ে আলগোছে হাত রেখে ভাবে গাঁয়ের পুরুষেরা সব যখন বাইরে চলে যায়, তখন একাই তাকে বহন করতে হয়, প্রতিটি গ্রামবাসীর দায়িত্ব। কতবার এমন হয়েছে! অন্যান্য গ্রামের মত এই গ্রামেও পড়ে থাকে কিছু নারী, বৃদ্ধা, শিশু আর অশক্ত বৃদ্ধ। তবু পৃথ্বীর বাইরে যাবার কথা ভেবে মাঝে মাঝে তার মনের মধ্যে কী যেন গুমরে ওঠে। মনে হয়, সে যেন নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে দেশের জন্য উৎসর্গ করতে পারছে না।

অমর চলে যাবার পর, পৃথ্বীও রওনা হয়। পায়ে হেঁটে তাকে যেতে হবে নন্দিনীকে নিতে। তার আগে একবার রুক্মিণীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। কতদিন তার সঙ্গে দেখা হবে না কে জানে। আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, জীবনে আর দেখাই হলো না। না, মানে রুক্মিণীর কিছু হোক, পৃথ্বী সেকথা ভাবে না। হয়ত সে নিজেই, করিমবক্সের মত মুঘলদের হাতে বন্দী হলো। কিংবা যেমন

বহু রাজপুতেরই হয়—যার জন্যে গ্রামে প্রৌঢ় বলতে কেউ-ই নেই। তাদের রক্তে উষ্ণমরুর তৃষ্ণা কিছুটা মিটেছে। মাড়োয়ার আর মেবারে এত বালির আধিক্য বলেই হয়ত তার মাটিতে রক্তের হোলি।

রুক্মিণীদের একটা গরু আছে। সেই গরু দুধ দেয় না। গাঁয়ে ষাঁড় নেই। রুক্মিণীর প্রায়ান্ধ বাবা ভিনগাঁয়ে গরুটাকে নিয়ে যেতে পারে না। কতবার রুক্মিণীর মনে হয়েছে পৃথ্বীকে বলবে। বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত মুখে আটকে গিয়েছে। সেই গরুটাকেই পরিচর্যা করছিল সে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে। দুধ না দিলেও গো-মাতা সাক্ষাৎ ভগবতী। আশ্চর্য! রুক্মিণীর মায়ের নামও ছিল ভগবতী—যে মায়ের দুধ পান করে সে বড় হয়েছে। গরুটির নাম সে কিংবা তার বাবা রাখেনি। খুব ছোটবেলায় তাকে যে লোকটি টানতে টানতে নিয়ে এসেছিল সে-ই ডেকেছিল ওই নামে।

পেছনে শব্দ শুনে চমকে ওঠে রুক্মিণী। পৃথ্বীকে দেখে মুখে হাসি ফোটে। সকাল থেকে পৃথ্বীর কথা বড় বেশী মনে হচ্ছিল। কোন কোন দিন এমন হয়—নতুন কিছু নয়। কিন্তু আজ বুকের ভেতরটা কেমন অস্থির করে উঠছিল। তাই সমস্ত ভাবনা-চিন্তা মন থেকে সরিয়ে ফেলার জন্যেই অসময়ে ভগবতীর সেবায় উঠে-পড়ে লেগে যায়। বাবা বলে—দুর্ভাবনা দুশ্চিন্তা মন থেকে তাড়িয়ে দেবার একমাত্র ওষুধ হচ্ছে কাজের মধ্যে ডুবে থাকা।

—এই গন্‌গনে রোদের মধ্যে কি হচ্ছে? দেবীর সেবা?

—নিশ্চয়। দেবীর সেবায় রোদ-জল বলে কিছু আছে নাকি?

—না, তা নেই। শুধু আমার বেলায়—

—তোমার বেলায়? তোমার বেলায় কি? গোরুর ওপরও হিংসে?

—মোটেই না। এমনি মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আসলে এটা কথার অলঙ্কার।

রুক্মিণী হেসে ওঠে।

ওর বাবা ঘর থেকে বলে ওঠে—কার সঙ্গে কথা বলছিস্ রে রুকি?

—যাও এবার। বাবার কাছে গিয়ে পরিচয় প্রদান কর।

—তুমিও চলো না কেন?

—না। তুমি যাও।

পৃথ্বী ঘরে গিয়ে বলে—আমি পৃথ্বী।

—তাই বল। আমার বোঝা উচিত ছিল। কদিন থেকে তোমার কথা ভাবছিলাম। গরুটার একটা ব্যবস্থা করতে হয়। তুমি যদি সাহায্য কর।

—কী ব্যবস্থা?

—ওটার অনেকদিন বাচ্চা হচ্ছে না। পাশের গ্রামে একটা ষাঁড় আছে যদি কয়েকদিন নিয়ে যেতে। দুধ না দিলে শুধু শুধু পোষা কি আমার পক্ষে সম্ভব? ওর খাবার জোটানোই দায়। রুক্মিণী কেমন করে চালায় জানিনা। কী খেতে দেয় তাও জানিনা।

পৃথ্বীর খেয়াল হয়। কথাটা তার ভাবা উচিত ছিল।

সে বলে—আমি অমরকে বলে যাচ্ছি। ফিরে এসে আবার গরুর ভার নেব।

—কোথায় যাচ্ছ?

—দুর্গাদাস ডেকে পাঠিয়েছেন। বেশ কিছুদিন বাইরে থাকতে হবে।

—যুদ্ধের খবর কি?

—একটা বড় রকমের কিছু হবে মনে হচ্ছে। তারই তোড়-জোড় চলছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ বলে—কবে যে শেষ হবে সব। যাহোক অমরকে তাহলে বলে যেও। ভুলোনা কিন্তু।

বাইরে এসে পৃথ্বী রুক্মিণীকে বলে—তোমার গরুর বাচ্চা হয় না

বলোনি তো ?

—সেকথা বলতে হয় নাকি ? বাচ্চা হলে দেখতেই পেতে। তুমি কি ভেবেছিলে বাচ্চা আছে ?

—না না, সেকথা নয়।

রুক্মিণী আচমকা লজ্জা পেয়ে যায়। তার বাবা পৃথ্বীকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছে মনে হচ্ছে।

পৃথ্বী রুক্মিণীর দিকে চেয়ে বলে—যাক্‌গে, অমরকে বলে দিয়ে যাব। তুমি অমর এলে গরুটাকে তার হাতে দিও।

—হঠাৎ অমর কেন ?

—আমি এখুনি চলে যাচ্ছি রুক্মিণী। সেই কথা বলতেই তো এসেছিলাম।

রুক্মিণী কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে অস্ফুটস্বরে বলে—চলে যাচ্ছ ? কোথায় যাচ্ছ ?

—ডাক এসেছে দুর্গাদাসের। বেশ কিছুদিনের জন্যে গ্রাম ছাড়ছি।

—কতদিনের জন্য ? কাঁপা কাঁপা গলায় প্রশ্ন করে রুক্মিণী।

—কি করে বলব। মনে হয়, এবারে একটা বড় কাজ দেবেন আমাকে।

—বড় কাজ ? কত বড় কাজ ?

একটু হেসে পৃথ্বী বলে,—তাও জানি না। জান, তাঁর ছেলে তেজসিং নিজে এসেছিল কিছুক্ষণ আগে।

—ও।

মুখের হাসি মিলিয়ে যায় রুক্মিণীর। তার চোখ দুটো জলে টল্‌ টল্‌ করে ওঠে। সে গরুর গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়।

—আমি যাই রুক্মিণী।

রুক্মিণীর সারা শরীর অবশ। সে পৃথ্বীর কথার উত্তর দিতে পারে না প্রথমটা। তারপর হঠাৎ তার মনে হয়, এ কী করছে সে ? সে

না রাজপুত রমণী ? এতদিনে পৃথ্বীর সঙ্গে তার বিয়ে হলে, স্ত্রী হিসাবে তো তারই কর্তব্য হতো পৃথ্বীকে যুদ্ধ সাজে সাজিয়ে দেওয়া। তবে কেন এই দুর্বলতা ?

সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। এগিয়ে এসে ঝুঁকে পৃথ্বীকে প্রণাম করতে যেতেই দুহাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলে পৃথ্বী। রুক্মিণী ওর চোখের দিকে চায়। তারপর ধীরে ধীরে বলে—আমাকে প্রণাম করতে দাও।

পৃথ্বী ওকে ছেড়ে দেয়। তারপর বলে—আমার তলোয়ারে মা চুমু দিয়েছেন। তুমি এই ছোরাটাতে দাও।

কোমর থেকে ছোরা বার করে সে রুক্মিণীর হাতে দেয়। রুক্মিণী সেটিতে ওষ্ঠ স্পর্শ করে ফিরিয়ে দিয়ে বলে—ঘরের জন্যে তোমার যেন কোন দুশ্চিন্তা না হয়। আমি তোমার মাকে দেখব। দুর্গাদাস যেন তোমার কাজে গর্বিত হন।

—হ্যাঁ রুক্মিণী।

পৃথ্বী বিদায় নিলে, রুক্মিণী এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলল না। এজন্যে নিজের সঙ্গে তাকে প্রবল যুদ্ধ করতে হল।

পর্বতের এক দুর্গমস্থানে দুর্গাদাসের সামরিক আবাস। পৃথ্বীর সেখানে গিয়ে পৌঁছোতে সন্ধ্যা পার হয়ে রাত্রি হয়ে গেল।

দুর্গাদাসকে ঘিরে বসে ছিল অনেকে। তারা সবাই সেনাপতি। তাদের নাম নিশ্চয় পৃথ্বী শুনেছে। তবে চোখে কখনো দেখেনি। তেজসিংও ছিল সেখানে। সবার মাঝখানে একটা অগ্নিকুণ্ড।

তেজসিং তাকে দেখে এগিয়ে আসে। তারপর নিয়ে যায় পিতার কাছে। সবার দৃষ্টি পড়ে তার উপর।

দুর্গাদাস তাকে একটা পাথরের ওপর বসতে ইঙ্গিত করেন। সে অভিবাদন জানিয়ে সেখানে বসে পড়ে। সে বুঝতে পারে এই

কয়জনই রাজা অজিত সিং-এর হয়ে রাঠোর জাতির নীতি-নির্ধারণ করে থাকেন। এঁরাই জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা। এঁদের পাশে বসার সুযোগ পেয়ে সে রোমাঞ্চিত হয়। যে কোন কারণেই হোক দুর্গাদাস তাকে খুব কাছে টেনে এনেছেন।

—তুমি কতটা কষ্ট সহ্য করতে পার পৃথ্বী সিং? দুর্গাদাস আচমকা তাকে এই অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসেন।

—আমি ঠিক বলতে পারি না।

—ধর, তোমার চোখের মধ্যে শলাকা বিঁধিয়ে দিয়ে কেউ যদি জানতে চায় দুর্গাদাস কোথায় আছে, তুমি কি বলে দেবে কষ্ট সহ্য করতে না পেরে?

সোজা হয়ে বসে পৃথ্বী দ্বিধাহীন চিত্তে বলে ওঠে—কখনই না।

হেসে দুর্গাদাস বলেন—কি করে বুঝলে? তেমন কি কেউ করেছে কখনো?

—না। এ জিনিষ মন থেকেই বোঝা যায়।

—ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি সেটুকু মনের জোর পাও। শোন, আমার গতিবিধির সবটুকু এবার থেকে তোমার জানা রইবে। কারণ তোমাকে এমন অনেক কাজ করতে হবে যার জন্যে আমার পরামর্শ তোমার দরকার হবে। তাছাড়া তুমি কি করছ সেটা জানাও আমার জরুরী প্রয়োজন হতে পারে।

পৃথ্বীর মুখে নিরানন্দের ছায়া পড়ে। তাকে কি শেষ পর্যন্ত গুপ্তচরের কাজ দেবেন দুর্গাদাস?

একটু দূরে খর অন্ধকার থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—না পৃথ্বী। ভয় নেই। গুপ্তচর হতে হবে না তোমায়।

এ যে সেই সন্ন্যাসী! অদ্ভুত! মনের কথা জানলেন কি করে? কেদার-বদ্রী যাওয়ার কথা ছিল—যাননি দেখা যাচ্ছে।

দুর্গাদাসের কৌতূহল হয় সন্ন্যাসীর মন্তব্য শুনে। পৃথ্বীর দিকে ফিরে তিনি বলেন,—গুপ্তচর বৃত্তিতে অত অনীহা কেন? দরকার

পড়লে তেমন কাজও করতে হতে পারে। জান আমি নিজেই মাঝে মাঝে গুপ্তচরের কাজ করি।

পৃথ্বী বিস্মিত হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আপাততঃ অন্তত তাকে গুপ্তচর হতে হচ্ছে না।

সন্ন্যাসীকে এখনো দেখতে পায় না পৃথ্বী। কারণ অগ্নিকুণ্ড থেকে অনেকটা দূরে বসে আছেন তিনি। সেখান থেকে সন্ন্যাসী বলেন— রুক্মিণী কেমন আছে পৃথ্বী সিং?

সঙ্কুচিত পৃথ্বী উত্তর দেয়—তার গরুটা বাচ্চা দিচ্ছে না। তাই তার খুব ভাবনা।

—কেন? বুড়ো হয়েছে?

—না।

—তবে?

—অমর সিংকে বলে এসেছি পাশের গাঁয়ে নিয়ে যেতে। সেখানে একটা ষাঁড় আছে।

ওর কথার ধরণে অনেকে হেসে ওঠে।

এবারে দুর্গাদাস বলেন—তোমাকে আর তেজসিংকে একটা বিপজ্জনক কাজে পাঠাব। তাই ডেকে এনেছি। তুমিই হলে দলপতি। তেজসিং তোমার সহকারী।

তেজসিংকে সঙ্গী হিসাবে পাওয়ার চিন্তায় পৃথ্বী কোনরকমে তার আনন্দ দমন করে গাম্ভীর্য বজায় রাখে। দুর্গাদাসের প্রতি তার শ্রদ্ধা নিমেষে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। নিজের পুত্রকে উপযুক্ত জেনেও অপর একজনের অধীনে পাঠাচ্ছেন তিনি।

—তেজসিংকে কি তুমি উপযুক্ত মনে কর?

—তাকে যতটুকু দেখেছি, উপযুক্ত বলেই মনে হয়। শুধু—

—ঠিক বলেছ। শুধু বয়সটা কম। তাই অভিজ্ঞতাও কম। তোমার অভিজ্ঞতা খুব ভালভাবে যাচাই করে দেখে, আমি তোমাকে ওর দল-নেতা নির্বাচিত করেছি।

পৃথ্বী দুর্গাদাসের চোখের দিকে সোজা দৃষ্টি ফেলে। তার অভিজ্ঞতার কথা তিনি জানলেন কি করে?

– তুমি গাঁয়ের দলবল নিয়ে কিশোর বয়স থেকে যেসব কাজ করে আসছ আমার অজানা নেই। তোমার যারা সঙ্গী ছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন এখন মৃত। দু'চারজন যারা আমার সঙ্গে আছে তোমার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর সংগঠন ক্ষমতার প্রশংসা করে তারা।

পৃথ্বী মাথা নত করে। গ্রাম ছেড়ে এসে তার কৈশোরের বন্ধুরা তাহলে পাকাপাকিভাবেই যোগ দিয়েছে দুর্গাদাসের সঙ্গে। সে ভেবেছিল, ওদের পরিবার মুঘলদের ভয়ে পর্বতের অরণ্যে পালিয়ে রয়েছে।

– শোন পৃথ্বী। অবস্থাটা তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। তুমি একথা নিশ্চয় জান, আওরঙজেব তাঁর প্রিয় পুত্র আকবরের ওপর বিরক্ত হয়ে তাকে চিতোরগড় থেকে সরিয়ে বাদশাহজাদা আজমকে চিতোরের ভার দিয়েছেন।

– আমি শুনেছি।

– এতে আকবর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। তার আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে। পিতার সঙ্গে কিছুদিন পত্রালাপ পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। লোকটা এমনিতে ভাল – গুণও আছে অনেক। কিন্তু বড্ড অলস আর বিলাসী। বাদশাহ তাঁর পুত্রটিকে সবচাইতে ভালবাসেন। আকবরের অভিমান অনুমান করে তিনি তাকে আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন। তাতে আকবরের মন ভাল থাকবে। আর এই কাজে তাকে সাহায্য করার জন্য একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান আর চতুর যোদ্ধাকে তার সহকারী হিসাবে পাঠিয়েছেন। নাম তার তাহেবর খাঁ। এই তাহেবর ছিল আজমীঢ়ের ফৌজদার। কিন্তু বাদশাহ জানেন না কূটনীতির চালে তাঁরই সমকক্ষ একজন রয়েছেন, তিনি হলেন মেবারের মহারাণা রাজসিংহ। তিনি আর এক চাল চেলেছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতায় দেখেছেন পৃথিবীতে এমন মানুষ হাতে গোনা

যায় যে লোভের বশবর্তী নয়। সেই লোভ নানান ধরণের হতে পারে। আর সেই লোভের মাপকাঠি হয়ত সবার সমান নয়। সেই লোভের টোপ ফেলে শেষ পর্যন্ত আকবরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন।

বিস্মিত পৃথ্বী বলে ওঠে – যোগাযোগ স্থাপন করেছেন!

–হ্যাঁ। আকবর আর তাহেবর মহারাণার টোপ অনেকটা গিলে ফেলেছেন।

সেই সময় অদূরে অশ্বক্ষুরধ্বনি শোনা যায়। সবাই উৎকর্ণ। একক অশ্বারোহী নিশ্চয় সংবাদদাতা। দুর্গাদাস কথা বন্ধ করে নীরবে অপেক্ষা করেন। কারণ লোকটি খুবই কাছে এসে পড়েছে।

সন্ন্যাসী এতক্ষণে অন্ধকার থেকে উঠে এসে সামনে বসেন। পৃথ্বী বুঝতে পারে অশ্বারোহীর আগমনকে সন্ন্যাসীও গুরুত্ব দিচ্ছেন।

লোকটি ঘোড়া থেকে নেমে সেটির লাগাম দণ্ডায়মান একজনের হাতে ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসে। তার মুখে পথশ্রমের ক্লান্তি ছাড়া কোন উত্তেজনা নেই। খুবই নির্লিপ্ত ভাব। বহু বছর কত ধরনের চমকপ্রদ সংবাদ বহন করে অভ্যস্ত বলে, এখন কিছুতেই সে উত্তেজনার খোরাক পায় না বলে পৃথ্বীর মনে হল।

সে কাছে এসে দাঁড়াতে দুর্গাদাস বলেন – বল রামসিং।

–দুঃসংবাদ এনেছি আজ। বৃদ্ধ রাজসিংহ পরশু রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

একটা অদ্ভুত আওয়াজ বার হয় সবার মুখ থেকে। তারপর অখণ্ড এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকে। এতক্ষণ যে উদ্দীপনা সবার মুখে বিরাজ করছিল সংবাদদাতা বাইরের এক ঝলক দম্‌কা হাওয়ার মত এসে এক ফুৎকারে তা নিভিয়ে দিল।

সন্ন্যাসী প্রথম কথা বলেন – সব কিছু একটু পেছিয়ে গেল। তবে বেশীদিনের জন্য নয়। কিছু ভেবো না দুর্গাদাস। সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা কাজ চালিয়ে যাও। রাণার পদ নিয়ে কোনরকম বিবাদ হবে না। জ্যেষ্ঠ পুত্র হবে রাণা। সে নিজে মস্ত বীর। পিতার

মত না হলেও বুদ্ধিমান আর কৌশলী।

দুর্গাদাস মাথা নেড়ে বলেন—হ্যাঁ। কিন্তু আকবর আর তাহেবরের মনে কোনরকম দ্বিধা জাগবে না তো?

—নিশ্চয় জাগবে। তবু তারাই আবার এগিয়ে আসবে। অন্য পথ খোলা নেই তাদের জন্য। তাহেবরকে বাদশাহ আগে যতখানি বিশ্বাস করতেন এখন ততটাই অবিশ্বাস করেন। নিজেকে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এখন আকবরকে আঁকড়ে থাকা ছাড়া গতি নেই তার।

দুর্গাদাস কিছুক্ষণ চিন্তা করেন। তারপর রামসিংকে বলেন—আর কিছু খবর আছে?

—না। নতুন রাণা বললেন, শ্রাদ্ধ মিটলেই তিনি আকবরের কাছে লোক পাঠাবেন।

—ঠিক আছে। তুমি বিশ্রাম করতে যাও।

পৃথ্বী মেবারের রাণাকে দেখেনি। তবু মনে হল তার, রাজপুতরা একটা বিরাট অবলম্বন হারিয়ে ফেলল। দুর্গাদাসের মুখে কয়েক-মুহূর্তের জন্য তারই ছায়া সে ভেসে উঠতে দেখেছিল। রাজসিংহের কোন বিকল্প নেই। এখন একমাত্র ভরসা দুর্গাদাস।

দুর্গাদাস পৃথ্বীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলেন—তোমাদের দায়িত্ব অনেকগুণ বেড়ে গেল। তুমি তো শুনলে আকবরের সঙ্গে আমাদের একটা গোপন চুক্তি বেশ কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছিল। মনে রেখো আকবর আওরঙজেবের প্রিয়তম পুত্র হলেও, আকবরের দলের অধিকাংশ সেনাপতিই বাদশাহের প্রতি বিশ্বস্ত। তারা বাদশাহের সৈন্য হিসাবে আকবরের অধীনে কাজ করছে। তারা যদি অন্য কোন রকম আভাস পায় তাহলে আকবরের প্রাণসংশয় তো বটেই শিশোদীয় আর রাঠোরদের মিলিত চেষ্টায় গড়ে তোলা একটা বিরাট সম্ভাবনা বিনষ্ট হবে।

পৃথ্বী বলে—আমাদের ওপর কী আদেশ জানতে ইচ্ছা হয়।

—আকবর সোজাত-এ শিবির স্থাপন করেছে বেশ কিছুদিন। তোমরা দুজনে সেখানে চলে যাও। একটু অন্যরকম ভাবে যাবে। কেউ যেন যোদ্ধা বলে চিনতে না পারে।

—সেখানে আমাদের কাজ কি হবে?

—বীরেন্দ্র সিং নামে একজন ধনী রয়েছেন সেখানে। বিরাট পাথরে তৈরী তাঁর একটা প্রাসাদ রয়েছে। অতি বৃদ্ধ তিনি—নিঃসন্তান। একা থাকেন সেই বাড়িতে। দেখাশুনা করার জন্যে দু একজন রয়েছে। তোমরা দুজনা তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠবে। আমার নাম বললেই তোমরা আশ্রয় পাবে। তোমরা যখনই রওনা হও, সোজাত-এ পৌঁছতে হবে কিন্তু রাতের বেলা। গভীর রাত হলেই ভাল হয়। কারণ তোমাদেব ঘোড়া দুটো যেন কারও নজরে না পড়ে। সেখানে পৌঁছে বীবেন্দ্র সিং এর বাড়িতে ঘোড়া দুটোকে লুকিয়ে রাখতে হবে। তোমাদের কাজ হবে দিনের বেলা দুকান দুচোখ খুলে চলাফেরা করা। হাটে-বাজারে ঘোরাফেরা করা। অনেক কিছুই দেখতে পাবে। অনেক কথা শুনতে পাবে। যদি মনে কর, কোন অস্বাভাবিক কিছু দেখছ বা শুনছ, তাহলে আমাকে খবর দিতে হবে।

তেজ সিং বলে—কোন্ জিনিষকে অস্বাভাবিক ভাবব?

—সেকথা আমি বলব না। তোমাদের দুজনার বিচার আর বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে। আর একটি কথা বলে দি। মুখ বন্ধ করে চলবে।

পৃথ্বী বলে ওঠে—কিন্তু আপনি কবে নাগাদ পৌঁছোবেন?

সবাই চকিত দৃষ্টিতে পৃথ্বীর দিকে চায়। দুর্গাদাস বলে ওঠেন—তুমি কি করে জানলে আমি যাব?

—সেই রকম অনুভব করছি। ভাবছি অস্বাভাবিক কিছু দেখেই যদি খবর দিতে হয় তাহলে আপনার যাওয়া বন্ধ হবে।

—হ্যাঁ। তাহলে আমার বদলে ইন্দ্রভানু যাবেন। তোমার অনুভূতির তীব্রতা বড় বেশী পৃথ্বী।

সন্ন্যাসী বলেন – ভালই বাছাই হয়েছে তোমার।

পৃথ্বী বলে – সিংহের গহ্বরে আপনি নিজে না গেলেই তো হয়।

– না। সেজন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। যা বললাম তাই করবে। গহ্বরটা সিংহের কিংবা শৃগালের সে বিচার আমার।

লজ্জিত পৃথ্বী চুপ করে যায়। বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল সে।

– বীরেন্দ্র সিং খাঁটি রাঠোর। মনে রেখো, শুধু বার্ধক্যের জন্যেই তিনি নিষ্ক্রিয়। নইলে এই দুর্দিনে তিনি অমন বসে থাকতেন না।

সোজাত এমন কিছু একটা বিরাট নগরী নয়। কিছু জনবসতি রয়েছে। তবে যুদ্ধের দিক দিয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান বলা যেতে পারে। সমস্ত মাড়োয়ারের প্রায় মাঝামাঝি। একদিকে যোধপুর, অন্যদিকে নাদোল। একটি ছোট্ট ব্যবসা কেন্দ্র রয়েছে।

দুর্গাদাসের নির্দেশ অনুযায়ী ওরা উভয়ে প্রায় মাঝরাতে নগরীতে প্রবেশ করল। দোকান পাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে রাস্তা দিয়ে এক-আধজন যাতায়াত করছে। দেখলেই বোঝা যায় তারা মুঘল-সৈন্য। অচেনা জায়গা বলে ওদের কয়েকবার আত্মগোপন করতে হয়েছে। শেষে দুর্গাদাসের নির্দেশমত বীরেন্দ্র সিং-এর বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হয় ওরা। অন্ধকারের মধ্যে বাড়িটি একটি ফাঁকা জায়গায় প্রেতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ওরা দুজন প্রধান ফটকের সামনে এসে ধাক্কা দেয়। কিন্তু কোন সাড়া নেই। বাতির আলোও দৃষ্টিগোচর হয় না কোন। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর তেজসিং পদাঘাত করে। ঝন্ ঝন্ করে ওঠে মজবুত ফটক। কিছুক্ষণ পরে ভেতরে যেন সাড়া পাওয়া যায়। কোথাও কোন দরজা অর্গলমুক্ত হতে শোনা গেল। আরও কিছুক্ষণ পরে দূর থেকে ক্ষীণ পদশব্দ ভেসে আসতে থাকে।

তেজসিং বলে – কে যেন আসছে।

—হ্যাঁ। এটা একটা দুর্গই বটে।

একটু পরে দরজার ওপাশে পদশব্দ এসে থেমে যায়। একটা আলোর অতি সূক্ষ্ম রেখা কোন্ ফাঁক গলিয়ে এপাশে উঁকি দেয়।

ওদিক থেকে প্রশ্ন—কে আপনারা?

পৃথ্বী ফিস্‌ফিস্ করে বলে তেজসিংকে—কি করে বুঝল আমরা দুজনা? কথা বলতে শুনেছে?

—হতে পারে।

—না। মনে হয় ওপর থেকে দেখার কোন ব্যবস্থা আছে।

আবার প্রশ্ন আসে—কে আপনারা?

—দরজা খুলুন। আমরা দূর থেকে আসছি।

—কোথা থেকে?

—বীরেন্দ্র সিং জানেন।

—তিনি ঘুমোচ্ছেন। কাল দিনের বেলায় আসবেন।

—আমাদের অন্যত্র থাকার জায়গা নেই। থাকা নিরাপদও নয়।

—সেই জন্যেই বলছি, কোথা থেকে আসছেন স্পষ্ট করে বলুন।

—দুর্গাদাস পাঠিয়েছেন।

—একথা আগে বলা উচিত ছিল।

লোকটি কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে চাপা গলায় বলে—আশেপাশে তাকিয়ে দেখুন কাউকে দেখতে পাচ্ছেন?

দুজনা খুব ভাল করে দেখে নিয়ে বলে—না তো? কাউকে দেখছি না।

ঘটাং করে প্রধান ফটক খুলে যায়। দুজন অশ্বারোহী ভেতরে ঢুকে যায়। ফটক বন্ধ হয়।

লোকটি একটি ছাউনি দেখিয়ে বলে—ওই ছাউনির পেছনে রয়েছে অশ্বশালা, সেখানে ঘোড়া রেখে আসুন। সামনে রাখা চলবে না। আচ্ছা, আমার সঙ্গে আসুন।

ওরা ঘোড়ার লাগাম ধরে হাঁটতে হাঁটতে তাকে অনুসরণ করে।

যেখানে এসে পৌঁছোয় সেখানে অন্তত বিশটা ঘোড়া থাকতে পারে। একটি সুন্দর ঘোড়া বাঁধা রয়েছে।

ওরা খুব সন্তুষ্ট হয়। ঘোড়া দুটো রেখে লোকটিকে আবার অনুসরণ করে ওরা। সে ওদের নানান পথ ঘুরে, অসংখ্য সিঁড়ি ভেঙে বাড়ির অভ্যন্তরে নিয়ে যায়।

তেজসিং বলে—তুমি একাই সব দেখাশোনা কর নাকি?

—না। আরও দুজন রয়েছে। তারা ঘুমোচ্ছে। তাছাড়া দিনের বেলায় বাইরে থেকে দুজন আসে।

—তারা যদি আমাদের ঘোড়া দেখে ফেলে?

—কোন ক্ষতি নেই।

ওরা স্বল্প আলোয় লক্ষ্য করে লোকটার গায়ে অনেক ক্ষতচিহ্ন চক্‌চক্‌ করছে।

পৃথ্বী হেসে বলে—এখন বৃদ্ধ হলেও, এককালে লড়াই করেছ দেখছি।

—সামান্য। বীরেন্দ্র সিং-এর চিরকালের সঙ্গী আমি। বীরেন্দ্র সিং আমার চেয়ে দশ বছরের বড়। ওঁর সঙ্গে ছিলাম বলে টুক্‌টাক্‌ অস্ত্র ধরতে হয়েছে।

পৃথ্বী বলে—আমরা বেশ কিছুদিন এখানে থাকব। একটা আলাদা ঘর দিলে ভাল হয়।

—ঘরের অভাব নেই।

—কাল বীরেন্দ্র সিং-এর সঙ্গে দেখা করব। আজ শুয়ে পড়ব এখন।

—তার আগে কিছু খেয়ে নিন দুজনে।

—কিন্তু তোমরা নামটা জানা হল না।

—লক্ষ্মণ সিং।

পরদিন বীরেন্দ্র সিং ওদের দেখে সন্তুষ্ট হলেন। বললেন—যতদিন খুশী থাকো তোমরা। দুর্গাদাস যে তাঁর নিজের ছেলেকে এভাবে পাঠিয়েছেন, তাতে আমার খুব আনন্দ হল। আমার দৃঢ়

বিশ্বাস তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

পৃথ্বী বলে – আমরা একটু ঘোরাফেরা করতে চাই।

– নিশ্চয়। আচ্ছা, তোমরা কখনো যোধপুরে গিয়েছ ?

পৃথ্বী বলে – আমি মাত্র একবার গিয়েছি। তেজসিং কয়েকবার গিয়েছে।

বীরেন্দ্র সিং বলেন – ওতেই হবে। শোন যোধপুরে আমার একটা ক্ষুদ্র ব্যবসা ছিল। এমন কিছু নয়। তবু লোকে জানে। তোমরা দুজনা এসেছ যোধপুর থেকে। সেই ব্যবসা আর চলছে না। তাই এখানে কিছু কবার জন্যে আমি ডেকে পাঠিয়েছি।

ওরা ঘাড় কাত করে সায় দেয়।

– তাই বলে যোধপুরের গল্প জুড়ে বসো না। ধরা পড়ে যাবে।

– না। আমরা কম কথা বলব এই প্রতিজ্ঞা করেই এসেছি।

বিশ-পঁচিশ দিন কেটে যায়। ওরা ঘুরে ঘুরে সব কিছু দেখে, সব কিছু শোনে। কিন্তু দুর্গাদাসের পরামর্শ মত মুখ ফুটে বড় একটা কিছু বলে না। তেজসিং মাঝে মাঝে অনুযোগ করে, বসে থেকে থেকে ঘোড়া দুটো মোটা হয়ে যাচ্ছে। আসলে ঘোড়ায় চাপতে না পেরে তেজসিং ছট্‌ফট্ করে। পৃথ্বীরও খুব একটা ভাল লাগে না, তবে বয়স একটু বেশী বলে তার ছট্‌ফটে ভাব কম।

ওরা দুজনে বুঝতে পারে আকবর একটা অপদার্থ। তাহেবরের কথামত সে চলে। অধিকাংশ সময় সুরায় মত্ত থাকে। তাই নিয়ে সাধারণ মুঘল সেনার মধ্যে কানাকানির বিরাম নেই।

মজা করে সেনারা বলাবলি করে – বাদশাহজাদার অধীনে থাকলে যুদ্ধ করে প্রাণ দিতে হয় না। শুয়ে বসে বেশ কেটে যায়।

দূরের আর কাছের পাহাড়গুলোর দিকে আঙুল উঁচিয়ে দেখিয়ে ওরা বলে – ওই পাহাড় ? সর্বনাশ। কে যাবে ওসব জায়গায়। মৃত্যুর ফাঁদ পেতে রেখেছে দুর্গাদাস।

শুনে পৃথ্বীরা দুজনাই খুব গর্ব অনুভব করে।

বীরেন্দ্র সিং-এর প্রাসাদ ওরা ঘুরে দেখেছে। দেখার অনেক কিছু আছে। দেয়ালে বড় বড় তৈলচিত্র। বিচিত্র সব আসবাব। একটি ছোট্ট অস্ত্রাগার। সব চাইতে তাদের আকৃষ্ট করেছে প্রাসাদ থেকে বাইরে যাবার একটি গুপ্তপথ এবং একটি চোরা-কুঠ্‌রী। এমনিতে দেখে কারও সাধ্য নেই বুঝতে পারে। মনে হয় সাধারণ দুটো আলমারী। সেই আলমারীতে অনেক রকমের জিনিস সাজানো রয়েছে। অথচ বিশেষ কৌশলে সেটিকে টেনে ধরলে কপাটের মত খুলে যায়। একটি খুললে দেখা যায় অন্ধকারের মধ্যে ধাপের পর ধাপ সিঁড়ি নেমে গিয়েছে পাতালের দিকে। অন্যটি খুললে দেখা যাবে, একটি ক্ষুদ্র কক্ষ। সেখানে শয্যা আছে, বসবার জায়গা রয়েছে। বাতায়ণ না থাকলেও আলো বাতাস প্রবেশের সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে।

বীরেন্দ্র সিং নিজে এই দুইটি দেখিয়ে বলেন—আমার আয়ু তো ফুরিয়ে আসছে। এই প্রাসাদ একদিন দুর্গাদাসের কাজে লাগতে পারে। তাই তোমাদের দেখিয়ে দিলাম সব কিছু।

সেই সময় তেজসিং বলে বসে—আমাদের ঘোড়া দুটো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আপনি অনুমতি দিলে একটু চড়ে বেড়াতে পারি।

বীরেন্দ্র সিং একটু ভেবে নিয়ে বলেন—সেটা একটা বিরাট ঝুঁকি। তোমাদের প্রাণ সংশয় হতে পারে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ সেটি ব্যর্থ হবে। আর কিছু না হলেও ঘোড়া দুটো খোয়া যেতে পারে। ঘোড়ার বড় বেশী চাহিদা মুঘলদের। দেখলেই কেড়ে নিতে পারে।

—যদি রাতের বেলায় গোপনে বার হই।

—রাতেও নিরাপদ নয়। তবে ঘোড়া দুটোর পরিশ্রম করা দরকার ঠিকই। আর একটা ঘোড়া তো দেখেছ। একমাস ধরে দানা-পানি খেয়ে চলেছে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে।

—ওটি কার ঘোড়া ?

—কারও নয়। রেখে দিয়েছি দরকার হতে পারে ভেবে। তোমরা

রাতে ঘোড়া নিয়ে বাইরে যেতে পার। তবে যদি কখনো সামান্যতম সন্দেহও হয় যে কেউ তোমাদের অনুসরণ করছে, তাহলে কখনো আর এ-বাড়িতে ঘোড়ায় চেপে ফিরে এসো না। কোথাও ঘোড়া লুকিয়ে রেখে গোপনে চলে আসবে। আমি পরে ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব।

বীরেন্দ্র সিংহের কথা শুনে তেজসিং খুবই উৎফুল্ল হল।

কিন্তু সেই দিনই অপরাহ্ণে হাঁটতে হাঁটতে বাজারে যাবার পর এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটল, যার ফলে তাদের রাতের অন্ধকারে অশ্বারোহণের সখ আর মিটল না। পৃথ্বীর মন ভরে উঠল সংশয় আর অস্বস্তিতে।

বাজারে ওরা প্রতিদিনই প্রায় যায়। কারণ ওখানে নানান্ ধরণের মানুষের সমাবেশ হয়, যাদের কথোপকথনের মধ্যে হাল্‌ফিল্ অনেক খবর জানা যায়। সেদিনও ওরা বাজারের মধ্যে লক্ষ্যহীনের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তেজসিং রাতের অভিযানের কল্পনায় মশগুল। এক একবার সে মুখ ফুটে বলে উঠছিল সে সব কথা। পৃথ্বীর বাধা দানে হুঁশ হচ্ছিল। পৃথ্বী জানে, তার পাশের অতিমূর্খ ক্রেতাও মুঘলদের চর হতে পারে।

সহসা এক অশ্বারোহীর ওপর পৃথ্বীর চোখ আটকে যায়। সে দৃষ্টি ফেলতেই অশ্বারোহী চকিতে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায়। অশ্বারোহী ওভাবে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে স্থানত্যাগ করল কেন? তার মানে, পৃথ্বীর মোটামুটি অন্য ধরনের পরিচ্ছদ হলেও সে পৃথ্বীকে চিনতে পেরেছে—যেমন পৃথ্বী তাকে এক লহমাতেই চিনে নিয়েছে। সে করিমবক্স ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

তেজসিংকে কথাটা বলতে গিয়েও বলল না সে। বললেও গুরুত্ব দিত না হয়ত। কারণ তাদের সাজ-পোষাক দেখে কেউ বলতে পারবে না, কোনদিন অস্ত্র ধরেছে তারা। কিন্তু করিমবক্স অত্যন্ত বুদ্ধিমান। তাই পৃথ্বী সোজা পথ দিয়ে না চলে ঘুরপথে ফিরে আসে বীরেন্দ্র

সিং-এর প্রাসাদ। তেজ সিং বারবার তাকে প্রশ্ন করেছে। এমন অদ্ভুতভাবে সে কেন ফিরছে। এটা ওটা বলে এড়িয়ে গিয়েছে পৃথ্বী।

তেজ সিং-এর অগোচরে বীরেন্দ্র সিংকে কথাটা বলতে তিনি অত্যন্ত উতলা আর চিন্তিত হয়ে পড়েন। বারবার জানতে চান, কেউ তাদের অনুসরণ করেছে কিনা। পৃথ্বী বলে যে সে কাউকে দেখেনি।

– ঠিক বলছ, কাউকে দেখোনি ?

– না। করিমবক্সকে চিনে ফেলেই আমি সাবধান হয়েছিলাম। নানান্ পথ ঘুরে বাড়ি ফিরি। পেছনে আমার লক্ষ্য ছিল। কাউকে দেখিনি।

– কাউকে না ?

– না।

– ভেবে দেখো পৃথ্বী, কোন ভিখারী ?

– না।

– কোন অন্ধ ?

– না। কিন্তু বাজারের সেই পাগলাটাকে দেখেছি। আপনার বাড়ির সামনে দিয়ে বিড় বিড় করতে করতে চলে গেল। ওকে রোজই দেখি, সব সময় বিড় বিড় করছে। আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না।

দৃঢ় স্বরে বীরেন্দ্র সিং বলেন, – তোমরা আজ রাতেই চলে যাও।

– আপনি কী বলছেন ?

– তবে রাতে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক। আজ রাতটা অপেক্ষা করার ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই দেখছি। যা হোক তোমরা প্রস্তুত থাকো।

পৃথ্বী ভীষণ দমে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই হয়ত দুর্গাদাস কিংবা ইন্দ্রভান দলবল নিয়ে এসে উপস্থিত হবেন। সব কথা তাঁদের জানানো জরুরী প্রয়োজন। নইলে এখানে এলে তাঁদের প্রাণ সংশয়

হবে। পৃথ্বী ভাবে প্রথম দায়িত্ব পালনেই অযোগ্যতার পরিচয় দিয়ে বসল সে।

পৃথ্বী ঠিক করে সারারাত পালা করে জেগে সামনের রাস্তার ওপর নজর রাখবে তারা দুজনা। এই পুরীতে প্রবেশের অন্য কোন পথ মুঘলদের আসতে দেখলে ব্যবস্থা নিতে হবে। কতখানি বিশ্বাস করে দুর্গাদাস তার অধীনে আপন পুত্রকে পাঠিয়েছেন। তেজ সিংকে কিছুতেই মরতে দেওয়া যায় না। তাকে বাঁচাতেই হবে।

সে তেজ সিংকে সমস্ত ঘটনা বুঝিয়ে বলতেই তেজ সিং প্রশ্ন করে—আগে এসব কথা বলনি তো ?

—তখন নিজেও অতটা গুরুত্ব দিইনি। বীরেন্দ্র সিং-এর সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম বিপদটা কত বেশী।

মনে হল, তেজ সিং সন্তুষ্ট হল না পৃথ্বীর কথায়।

পৃথ্বী বলে—আজ আমাদের সারারাত জেগে থাকতে হবে। প্রথম রাত তুমি জাগবে।

আর কোন প্রশ্ন করে না তেজ সিং। পৃথ্বী তার নেতা। বিনা প্রশ্নে নেতার আদেশ পালনের শিক্ষা সে পেয়েছে পিতার কাছে।

রাত্রে খাওয়ার পরে সে পৃথ্বীর কথা মত বাতায়নের পাশে দাঁড়িয়ে রইল। ইচ্ছা করলে বসে থাকতে পারত সে। কিন্তু বসল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের পথের ওপর নজর রাখল। তারপর যখন নিঃসন্দেহ হল যে মধ্যরাত পার হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ তখন পৃথ্বীকে ডেকে তুলল। পৃথ্বী তার জায়গায় দাঁড়ালে তেজ সিং পাশেই শুয়ে পড়ল।

চারদিক নিস্তব্ধ। একফালি চাঁদ পশ্চিমের আকাশে দেখা যাচ্ছে। মৃদু হাওয়া বাইরে থেকে এসে পৃথ্বীর গায়ে হাত বুলিয়ে চলে যাচ্ছে। অদূরে রাতের কোন পাখী ডেকে উঠল।

প্রহরের পর প্রহর কাটে। পৃথ্বী ঠায় জেগে বসে থাকে। দৃষ্টি তার একইভাবে সামনের পথের ওপর নিবদ্ধ। এক সময়ে দূরে

কোথাও শৃগাল ডেকে ওঠে। রাত্রির শেষ প্রহরের ডাক তাদের। আশেপাশের গাছ-গাছালিতে থেকে থেকে ঘুমন্ত পাখীদের মধ্যে সামান্য চাঞ্চল্য দেখা যায়। ঊষা-লগ্ন সমাগত প্রায়।

সেই সময়ে পথের শেষ প্রান্তে, অনেকটা দূরে কয়েকটি আবছা মূর্তির আবির্ভাব ঘটে। রাত্রি জেগে একটু একটু চোখ জ্বালা করছিল পৃথ্বীর। ভাল করে রগড়ে নেয় দুই চোখ। না, ভুল না। ঘোড়-সওয়ার। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। পাঁচজন ঘোড়-সওয়ার। কারা এরা? দুর্গাদাস কি? পাঁচজনকে নিয়ে তিনি কখনই আসবেন না শত্রুর গহ্বরে।

অশ্বারোহীরা সাবধানে এগিয়ে আসছে। তবু স্তব্ধ ঊষায় ওদের অশ্বের খুরের আওয়াজ অস্পষ্ট কর্ণগোচর হয়। কে এরা? বীরেন্দ্র সিং-এর অনুমান কি ঠিক? ওই পাগলটি মুঘলদের চর?

হয়ত দেখা যাবে, ওরা এই প্রাসাদে প্রবেশ করবে না। হয়ত ভুল পথে এসেছে বিদেশী কোন পথিক। পৃথ্বী অপেক্ষা করে। তারপর ওদের সতর্কভাবে এগিয়ে আসতে দেখে তেজ সিংকে ডেকে তোলে।

তেজ সিং সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে পৃথ্বীর পাশে দাঁড়ায়। নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে—মুঘল।

হ্যাঁ। মুঘলই। স্পষ্ট দেখা যায় এবারে। ওরা সোজা এসে প্রধান ফটকের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর সজোরে ধাক্কা দিতে থাকে।

লক্ষ্মণ ছুটে এসে বলে—মুঘলরা এসে গিয়েছে। আমি খুলে না দিলে ওরা শেষ পর্যন্ত ভেঙে ফেলবে।

ওদের চিৎকারে তৎক্ষণে বীরেন্দ্র সিং-এর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি এসে বলেন—কী হয়েছে?

লক্ষ্মণ বলে—মুঘলরা এসেছে।

বীরেন্দ্র সিংহ বলেন—তোমরা দুজনা পালিয়ে যাও এই মুহূর্তে।

পৃথ্বী বলে—ওই সিংহদের সামনে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে?

আশ্রয়দাতার প্রতি যোগ্য প্রতিদান হবে বটে।

—যা বলছি কর। আমার কথা তোমাদের ভাবতে হবে না।

পৃথ্বী দৃঢ় কণ্ঠে বলে—দুর্গাদাস আমাকে পাঠিয়েছেন। অনুগ্রহ করে আমাকে নেতৃত্ব নিতে দিন।

—তুমি কি করবে?

—সেটা আমি দেখব। আপনার প্রতি আমার আদেশ নিজের ঘরে চলে যান।

বীরেন্দ্র সিং কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকেন। তারপর কী বুঝলেন বোঝা গেল না। তবে আজীবন সামরিক শিক্ষার শৃঙ্খলাবোধ তাঁকে বিনা বাক্যব্যয়ে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে গেল।

পৃথ্বী বলে,—লক্ষ্মণ সিং, তুমি গিয়ে ফটক খুলে দাও। ওরা যদি আমাদের দুজনার কথা জানতে চায় তাহলে বলবে, কাল রাতের প্রথম প্রহরে একজন চলে গিয়েছে। অন্যজন এখনও রয়েছে। তাড়াতাড়ি যাও, নইলে ফটক ভেঙে ফেলবে।

লক্ষ্মণ মুহূর্তের জন্য পৃথ্বীর দিকে বিহ্বল-দৃষ্টিতে চেয়ে আদেশ পালন করতে ছুটে যায়।

তেজ সিং প্রশ্ন করে,—এ সবের অর্থ?

—তুমি নিজে দেখলে, লক্ষ্মণ সিং বীরেন্দ্র সিং-এর মত এতবড় যোদ্ধা আমার কথা মেনে নিলেন। এবারে তুমি আমার সঙ্গে এসো।

তেজ সিং পৃথ্বীকে অনুসরণ করে। পৃথ্বী সেই দুই আলমারীর একটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বীরেন্দ্র সিং-এর দেখিয়ে দেওয়া কৌশলে তার কপাট খুলে ফেলে। অন্ধকারের মধ্যে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে অতলে।

—চলে যাও তেজ সিং।

—না। সোজা হয়ে দাঁড়ায় দুর্গাদাস-তনয়।

—আমার আদেশ। দেশের মঙ্গলের জন্য, দেশের স্বাধীনতা

রক্ষার জন্য এই আদেশ। তুমি গিয়ে তোমার বাবাকে খবর দিতে পারবে। নইলে তাঁর জীবন বিপন্ন হবে।

—না। কণ্ঠস্বর কেঁপে ওঠে কিশোর তেজ সিং-এর।

—তুমি সৈনিক তেজ সিং। এই শেষবার বলছি। একটুও সময় নেই। নেমে যাও।

—আর তুমি ?

—আমি সাধ্যমত মোকাবিলা করব।

—তুমি মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ছ পৃথ্বী।

সেই সময় দূরে দ্রুত পদশব্দ শোনা যায়। ওরা একটু পরেই এসে পড়বে।

পৃথ্বী বলে—যাও।

তেজ মাথা নিচু করে সিঁড়ির দিকে নামতে থাকে। পৃথ্বী কপাট বন্ধ করে দেয়। আলমারীতে শোভা পাচ্ছে কয়েকটি দর্শনীয় দ্রব্য। পৃথ্বী নির্লিপ্তভাবে তলোয়ার কোষমুক্ত করে একদিকে দাঁড়িয়ে থাকে।

নানান কক্ষে ছোটাছুটি করছে মুঘল সেনারা তাদের সন্ধানে। না পেয়ে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে বোঝা যাচ্ছে। কারণ ওদের চিৎকার বেড়ে চলেছে। পৃথ্বী শুধু প্রার্থনা করে বৃদ্ধ বীরেন্দ্র সিং-এর যেন কোন ক্ষতি না হয়। আর ঈশ্বরকে ডেকে বলে, কিছুক্ষণ যেন শত্রুদের আটকে রাখতে পারে। তেজ সিং-এর ঘোড়া নেই। পায়ে হেঁটে তাকে অন্তত কিছুটা পথ যাবার সুযোগ করে দিতে হবে। এই দিনের বেলা লোকালয়ে লুকিয়ে থাকা তার পক্ষে অসুবিধা হবে। অন্তত একটা পাহাড় কিংবা ওই দূরের জঙ্গল।

সেই সময় তার কক্ষের কপাট ঝন্ঝন্ করে ওঠে। মায়ের চুম্বন এঁকে দেওয়া তলোয়ারটি একবার দেখে নেয় সে। কোমরে রয়েছে রুক্মিণীর স্পর্শ করা ছোরা। সে এগিয়ে গিয়ে দরজা খোলে স্থির অবিচল হাতে।

সামনে দাঁড়িয়ে আর কেউ নয়—করিমবক্স। তার পেছনে আরও

চারজন। করিমবক্স কাল বাজারে তাকে চিনতে পেরেছে। সুতরাং আজকে না চেনার প্রশ্নই ওঠে না।

—তেজ সিং কোথায় পৃথ্বী সিং?

—তেজ সিং?

—অভিনয় করো না। করিমবক্স জীবনে একবার যাকে দেখে তাকে ভোলে না।

—দেখতেই পাচ্ছি।

—কোথায় সে?

—কাল রাতের প্রথম প্রহরে রওনা দিলে কতদূর যাওয়া যায় তুমিই আন্দাজ কর। হ্যাঁ ঘোড়াটা বৃদ্ধ ছিল না।

—রসিকতা রাখো।

—তুমি কি বীরেন্দ্র সিং-এর কোন ক্ষতি করেছ? উনি আমাদের চেনেন না।

করিমবক্স হো হো করে হেসে ওঠে—চেনেন না। তা বটে। ওঁকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। আগে তোমাদের ব্যবস্থা করতে হবে। তেজ সিং কোথায়?

—বললাম তো। সে চলে গিয়েছে।

—পৃথ্বী সিং, এই শেষবারের মত জানতে চাইছি তেজ সিংকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ?

—মুঘলদের মত অনর্থক কথার অপচয় রাঠোররা পছন্দ করে না।

—ঠিক আছে।

পেছনের চারজনকে করিমবক্স হুকুম করে, প্রাসাদের প্রতিটি ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে। বলে, বীরেন্দ্র সিংহের হাত পা যেন বেঁধে রাখা হয়।

একজন বলে—আপনি একা থাকবেন? অন্তত একজনকে রাখুন।

—না না। আমি আহত নই এখন।

ওরা চলে যেতেই করিমবক্স তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পৃথ্বী সিং-এর ওপর। বিদ্যুৎ চমকের মত সেই সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ে পৃথ্বীর, মানুষের নাকি কৃতজ্ঞতাবোধ রয়েছে।

আজ করিমবক্সের মনোবল অসীম। নিজের আওতায় পেয়েছে পৃথ্বীকে। পৃথ্বীও মরিয়া। তার একমাত্র উদ্দেশ্য এরা যাতে এই বাড়ি তাড়াতাড়ি ছেড়ে না যেতে পারে। সুতরাং তাকে অনেকক্ষণ বেঁচে থাকতে হবে। সে লড়তে থাকে। অসির ঝন্ঝনানি সমস্ত প্রাসাদে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। সেই সময় এক তীব্র আর্তস্বর ভেসে আসে পাশের কোন কক্ষ থেকে। করিমবক্স সাময়িকভাবে বিচলিত হয়। সেই সুযোগে পৃথ্বী সিং তার হাতের ওপর আঘাত হানে। কিন্তু বর্ম পরিহিত হাত। আহত হয় না করিমবক্স। ক্রুদ্ধ চিৎকারে সে আবার ধেয়ে আসে। রাত্রি জাগরণের ফলে পৃথ্বী কিছুটা ক্লান্ত। সে বুঝতে পারে এই অসিযুদ্ধ সহজে বন্ধ হবার নয়। সে একটু সরে আসে বাতায়নের দিকে। আর তখনি বাইরে থেকে চিৎকার শুনতে পায়।

একী! এযে তেজ সিং-এর কণ্ঠস্বর! ও কি উন্মাদ হয়ে গিয়েছে! তার এতক্ষণের আপ্রাণ প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হল? হতাশ হয় সে। ঠিক সেই অসতর্ক মুহূর্তে করিমবক্সের তলোয়ারের খোঁচা লাগে তার বাম বাহুতে। সে বর্ম পরিহিত নয়। সে আহত হয়। রক্ত ঝরতে থাকে। গুরুতর না হলেও যথেষ্ট গভীর হয়েছে ক্ষত। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পাষাণের ওপর পড়ে পিছল করতে থাকে।

— আত্মসমর্পণ কর পৃথ্বী সিং। হয়ত জীবনটা যাবে না।

বাইরে অনেক কণ্ঠস্বর। তেজ সিং-এর গলা উচ্চগ্রামে। তবে কি দুর্গাদাস কিংবা ইন্দ্রভান দলবল নিয়ে পৌঁছে গেলেন! লড়তে লড়তে কান পাতে। রক্তপাতের অবসন্নতা তাকে একটু একটু করে দুর্বল করে ফেলছে।

— পৃথ্বী সিং, এখনো বলছি আত্মসমর্পণ কর।

— না করিমবক্স ! বরং তোমাকেই বলছি আত্মসমর্পণ করতে ।

— তুমি পাগল ? এখনি মরবে ।

— না । বন্দী হতে চাও, না মৃত্যু চাও করিমবক্স ?

করিমবক্স এবার আর পৃথ্বীর প্রাণের জন্য দ্বিধা বোধ করে না। পৃথ্বী বুঝতে পারে শেষ পর্যন্ত তাকেই প্রাণ দিতে হবে আজ ।

সে চেঁচিয়ে ওঠে — করিমবক্স, বাইরে দুর্গাদাস এসে গিয়েছেন ।

— বিশ্বাস করি না ।

— তেজ সিং-এর গলা শুনতে পাচ্ছ না ? ওই শোন ।

দূরে সরে যায় করিমবক্স । তেজ সিং পৃথ্বীর নাম ধরে ক্রমাগত ডেকে চলেছিল । তারা বাইরের দরজা দিয়ে ছুটে আসছে । তাদের ধারণা পৃথ্বী কিংবা বীরেন্দ্র সিং কেউ বেঁচে নেই ।

করিমবক্সের মুখে রক্তোচ্ছ্বাস কখনই দেখা যায় না । কিন্তু এখন তাকে দেখালো বহুদিনের পরিত্যক্ত মৃতদেহের মত ।

— এবার কি করবে করিমবক্স ?

মুঘল সেনারাও শুনতে পেয়েছিল বাইরের চিৎকার । তারা ছুটে এসে বলে — রাঠোররা আক্রমণ করেছে । পালান ।

ওরা অপেক্ষা না করেই ছুটে যায় বাইরের দিকে । পৃথ্বী জানে, দুর্গাদাস সত্যিই যদি এসে থাকেন, এদের একজনও প্রাণ নিয়ে পালাতে পারবে না ।

— বাঁচতে চাও করিমবক্স ?

করিমবক্স নীরব ।

— কত দিন না খেয়ে থাকতে পার ? জল পান না করে ?

— কেন ?

— জিজ্ঞাসা করছি ।

— পাঁচ দিনও পারি ।

— তবে এসো ।

পৃথ্বী দ্বিতীয় আলমারি খুলে ফেলে । ভেতরে চোরা কুঠরী ।

করিমবক্স বিহ্বল।

—যাও। ভেতরে যাও। যত তাড়াতাড়ি পারি বাইরে নিয়ে আসব। তবে বীরেন্দ্র সিং-এর যদি ক্ষতি হয় তোমার কপালে কি আছে বলতে পারি না। বীরেন্দ্র সিং তোমাদের বাদশাহজাদার কোন ক্ষতি করেন নি। বরং বলতে পার, ভালই করতে চেয়েছিলেন।

—এখনি তোমার ক্ষতের চিকিৎসা করাও পৃথ্বী।

—সে আমি দেখব।

পৃথ্বী সিং আলমারী বন্ধ করে তার ক্ষতস্থান দেখতে বসে। সাময়িকভাবে পৃথিবীর প্রতি তার আকর্ষণ নিঃশেষিত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বীরেন্দ্র সিং-এর কথা মনে পড়ে। সে লাফিয়ে উঠে ছুটতে থাকে তার কক্ষের দিকে।

কক্ষের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। মৃত মুঘল সৈনিক পড়ে রয়েছে রক্তাক্ত অবস্থায়। এক লাফে তাকে ডিঙিয়ে সে ভেতরে প্রবেশ করে। সেখানে আহত লক্ষ্মণ সিং ছট্‌ফট্‌ করছে।

—লক্ষ্মণ সিং! এ কি তোমার কাজ?

—হ্যাঁ। কিন্তু আমিও বোধহয় বাঁচব না!

—কোথায় লেগেছে তোমার?

—পাঁজরে। আমারই দোষ। লোকটাকে সহজভাবে নিয়েছিলাম।

বীরেন্দ্র সিং হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে ছিলেন। পৃথ্বী তাড়াতাড়ি তাঁর বাঁধন খুলে দেয়।

—এই বয়সেও লক্ষ্মণ দেখিয়ে দিল পৃথ্বী। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম। তোমরা ওকে বাঁচাও। ও আমার চিরকালের সঙ্গী। কিন্তু তুমিও দেখছি আহত?

পৃথ্বী লক্ষ্মণের পাশে বসে পড়ে দেখে আহতস্থানে গভীর ক্ষত। বুঝতে পারে না কতটা সংঘাতিক।

সেই সময়ে বাইরে পদশব্দ। একটু পরেই স্বয়ং দুর্গাদাসের প্রবেশ। চকিতে চারদিক দেখে নিয়ে তিনি লক্ষ্মণের সামনে ঝুঁকে পড়েন।

হেসে বলেন – তুমি মরবে না লক্ষ্মণ। তবে ভুগতে হবে। মুঘলকে কে খতম করল? তুমি পৃথ্বী?

– না। লক্ষ্মণ। আপনি ওকে চেনেন?

– বলো কি! একে কে না চেনে? আশ্চর্য! বুড়ো হাড়েও তোমার ভেল্‌কী খেলে দেখছি।

সবাই মিলে ধরাধরি করে লক্ষ্মণকে পাশের ঘরের শয্যায় শুইয়ে দেয়। দুর্গাদাস নিজে চিকিৎসা বিদ্যা ভালই জানেন। দায়ে পড়ে শিখতে হয়েছে। তাই তাঁর অভয়বাণীতে বীরেন্দ্র সিং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

তেজ সিং বলে – বাইরে তিন জনকে মেরেছি আমরা। আর এই একজন। অন্যজন কোথায় গেল? আমরা পাঁচজনকে আসতে দেখেছিলাম না পৃথ্বী সিং?

– চারজনই তো মনে হয়।

– কে বলল? এর মধ্যে ভুলে গেলে। স্পষ্ট পাঁচজনকে দেখেছিলাম তো।

– বোধহয় পালিয়ে গিয়েছে তাহলে।

– কি করে পালাবে? নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে রয়েছে এই বিরাট প্রাসাদের কোনখানে।

– না।

তার বলার ধরণে সবাই তার মুখের দিকে চায়। কি করে এত নিশ্চিন্ত হল পৃথ্বী?

দুর্গাদাস বলেন – পৃথ্বী, তুমি বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিলে। মরতে পারতে তুমি। মুঘলের তলোয়ার তোমার হাতে না লেগে বুকেও লাগতে পারত।

—ক্ষতি ছিল না কোন। তেজ সিং আর বীরেন্দ্র সিং জীবিত, এতেই আমার আনন্দ। তাছাড়া তেজ সিং-এর সঙ্গে দেখা হওয়ায় আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে আগে থেকে আপনি জানতে পেয়েছিলেন। নইলে কি যে হতো।

দুর্গাদাসের উদ্দেশ্য মোটামুটি সফল হল। আলমগীর-পুত্র আকবরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটল। তাহেবর খাঁও উপস্থিত ছিল। আলোচনার সূত্রপাতে আকবরের মধ্যে ছিল প্রবল দ্বিধা। কারণ রাজসিংহকে সে যেরকম বিশ্বাস করতে পেরেছিল জয়সিংহকে ততটা পারছেনা। তাছাড়া রাজসিংহকে যখন সে কথা দিয়েছিল, তখন অসুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। তার কিছুদিন আগে এক বিরাট মুঘল বাহিনী পর্যুদস্ত হয় রাজসিংহের হাতে। কিন্তু এখন রাজসিংহের মৃত্যুতে মেবারে রয়েছে কিছুটা অস্থির ভাব। সুতরাং আকবরের মনোবল আগের চেয়ে অনেক বেশী।

প্রথমে দুর্গাদাসকে যথেষ্ট চাপের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কারণ তাহেবর খাঁ খুব ঝানু লোক। কিন্তু একটা বিষয়ে দুর্গাদাস নিশ্চিন্ত ছিলেন যে তাহেবর খাঁ প্রচণ্ড লোভী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। আর আকবর কিছুটা তরলমতি। তাই প্রথম দিনে সফল না হলেও দ্বিতীয় দিনে আকবরের শিবিরে প্রবেশ করেই বুঝতে পারলেন হাওয়া তাঁর স্বপক্ষে বইতে শুরু করেছে। সুযোগ বুঝে তিনি যুক্তি আর আবেগ মিশিয়ে বলেন —দেখুন বাদশাহজাদা, আপনার যে নাম সেই নামেই একসময়ে হিন্দুস্থানে রাজত্ব করে গিয়েছেন মুঘল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাহানশাহ। আপনার পিতা তাঁর আমলে রাজ্যের কিছুটা বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন বটে, কিন্তু তা হল পদ্মপত্রে জলের মত ক্ষণস্থায়ী। তাঁকে কেউ কখনই জালালউদ্দিন আকবরের ওপর আসন দেবেনা। কারণ আকবর বাদশাহের যে গুণ যে দূরদৃষ্টি আর উদারতা ছিল আপনার পিতা সে সব থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। আকবর শাহ উপলব্ধি করেছিলেন এই

দেশে হিন্দু, বিশেষ করে রাজপুতরা একটা প্রবল শক্তি। ক্রমাগত তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে নিশ্চিন্তে তখত্‌তাউশে বসে থাকা সম্ভব নয়। তাই তিনি তাদের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করে চলেছিলেন। তাদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করে, তাদের বিশ্বাস করে নানান ধরনের উচ্চ আসন দিয়েছিলেন। এতে কি তিনি ঠকেছিলেন? বলুন। আপনিই বলুন।

স্বভাবতই বাদশাহজাদা দুর্গাদাসের কথায় সায় দিয়েছিল। তখন দুর্গাদাস আবার শুরু করেন—আপনার পিতা আমাদের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যে কতবার আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন আপনার কিছুই অজানা নেই। তিনি দেবমন্দিরগুলো একটির পর একটি ভেঙে ফেলেছেন। রাজপুতরা আর কতদিন এসব সহ্য করবে? তারা যুদ্ধের পর যুদ্ধ হেরে যেতে পারে। কিন্তু পৃথিবী থেকে তারা নিঃশেষিত হবে না কখনই। তারা বনে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকবে। আর সময় বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়বে আপনাদের ওপর। এভাবে একটা বিরাট সাম্রাজ্য চালানো যায় না। ক্রমাগত যুদ্ধ করে সেকেন্দার শাহের মত দেশের পর দেশ জয়ের আনন্দ পাওয়া যায় কিন্তু স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আমরা কখনই বলিনি যে মুঘলদের সঙ্গে আমরা থাকব না। আমাদের মহারাজা যশোবন্ত সিং শাহানশাহ শাহজাহান, তাঁহার পুত্র দারাশুকো এবং আপনার পিতার অধীনে বিশ্বস্ততার সঙ্গেই কাজ করে গিয়েছেন। তিনি প্রথমে আপনার পিতার বিপক্ষে ছিলেন। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। দেশে যখন অস্থিরতা দেখা দেয়, মানুষ তখন তার পছন্দমত দিকেই যায়। কিন্তু একথা কখনই বলা যাবে না আপনার পিতার আনুগত্য স্বীকারের পরে তিনি অবিশ্বাসের কোন কাজ করেছিলেন।

এই কথা বলার সময় আকবর রীতিমত বিচলিত হয়ে বলে ওঠে—আমি সব কিছু বুঝতে পেরেছি। আপনার প্রস্তাব আপনি বলুন।

দুর্গাদাস কিছুক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে বলেন—আমার প্রস্তাব

হল, মুঘল সম্রাট হিন্দুস্থানে রাজত্ব করুক, কিন্তু সেই সঙ্গে রাজপুতরাও তাদের স্বাধীনতা নিয়ে বেঁচে থাকুক। বিরাট এই দেশে এটা অসম্ভব কিছু নয়। আকবর শাহের রাজত্বই তার প্রমাণ।

অধৈর্য আকবর বলে—হ্যাঁ, জানি—জানি। কী করতে বলেন আপনি?

দুর্গাদাস তাহেবর খাঁ আর বাদশাহজাদার চোখে দেখলেন সেই লোভের আগুন। মনে মনে তিনি সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত হন। এই ব্যক্তি দিল্লীর মসনদে বসলে মুঘল-রাজত্ব শেষ হয়ে যাবে না তো? মুঘলরা দুর্বল হয়ে পড়লে বাইরে থেকে হিন্দুস্থানের ওপর আক্রমণ আসবে। কিন্তু অত ভেবে লাভ নেই। রাঠোরদের স্বাধীনতা সবার আগে। অজিত সিংকে পূর্ণ মর্যাদায় সিংহাসনে বসাতে হবে।

তিনি বলেন—আপনি হবেন দ্বিতীয় আকবর শাহ যিনি এই দেশে সুখ আর শান্তি ফিরিয়ে আনবেন। আমরা বিশ্বস্তভাবে চিরকাল আপনাকে শক্তি জুগিয়ে যাব। বাইরে থেকে কোন আক্রমণ হলে মুঘল সেনার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে সেই আক্রমণের মোকাবিলা করব। কিন্তু তার আগে আপনি যখন নিজেকে বাদশাহ হিসাবে ঘোষণা করবেন তখন আপনার সৈন্যদলের সঙ্গে আগে শিশোদীয় আর রাঠোররা মিলিতভাবে হিন্দুস্থানের বর্তমান অযোগ্য বাদশাহকে আক্রমণ করবে, যিনি রাজপুতদের মিত্রতা না চেয়ে চিরকাল তাদের ধ্বংস চেয়ে এসেছেন।

আকবর চেঁচিয়ে ওঠে—তাহেবর খাঁ।

সচকিত তাহেবর বলে ওঠে—বলুন শাহজাদা।

—তোমার কি মত?

—এ বিষয়ে দ্বিমতের প্রশ্ন কোথায়? দুর্গাদাসের মত বিজ্ঞ ব্যক্তি সব কিছু যেভাবে বিশ্লেষণ করে বললেন, তাতে প্রাঞ্জলভাবেই বোঝা গেল।

—ঠিক। ঠিক বলেছ। শেষের দিকে যুদ্ধে তোমার যে রকম

অরুচি লক্ষ্য করছিলাম, তাতে সন্দেহ হয়েছিল বুদ্ধিতেও বুঝি তোমার মরচে ধরেছে। ধারণাটা দেখছি ভুল।

তাহেবর আর দুর্গাদাসের মধ্যে গোপনে দৃষ্টি বিনিময় হয়। আজকের এই ষড়যন্ত্রের ভিত্তি গড়ে তোলার কাজ তাহেবর একাই শুরু করেছিল প্রথমে মহারাণা রাজসিংহের কাছে দূত পাঠিয়ে। রাজসিংহের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে সে যুদ্ধে ঢিলে দিতে শুরু করেছিল। স্বয়ং আওরঙ্গজেবও এর কোন ব্যাখ্যা খুঁজে না পেয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাহেবর তখন উচ্চাশার রঙীন সৌধ নির্মাণ করে চলেছে। আজমীরের সামান্য ফৌজদার নয়, তার স্থান হওয়া উচিত অনেক অনেক উর্ধ্বে।

দুর্গাদাস উঠে দাঁড়িয়ে চমৎকার ভঙ্গীতে কদমবোশী করে বলেন— তাহলে ভাবী শাহানশাহ, সর্বপ্রথম একজন রাজপুতের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

আকবর উৎসাহে টগবগ করে ফুটতে থাকে। সে বলে—কয়েকদিন সময় দিন রাঠোর নেতা। আমি ঘোষণা করব বাদশাহকে আক্রমণ করার ঠিক আগের মুহূর্তে—অর্থাৎ আজমীরের একেবারে কাছাকাছি গিয়ে। বর্তমান বাদশাহকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পেতে চাই।

—ঠিক বলেছেন। আমার বুদ্ধিতে অতটা খেলেনি। হিন্দুস্থানের বিরাট দায়িত্ব আপনার উপর এলে, আপনার বুদ্ধি যে কতটা ক্ষুরধার হয়ে উঠতে পারে এটাই তার প্রমাণ।

তাহেবর দুর্গাদাসকে বলে—মেবারের নতুন রাণা আজকের আলোচনায় খবর কিভাবে জানবেন?

—আমি আজই দূত পাঠাব। আমরা সবাই একই সঙ্গে এগিয়ে যাব আজমীরের দিকে। তিন শক্তি আজমীরের অদূরে গিয়ে মিলিত হব।

আকবর বলে—আর তখনি আমি নিজেকে হিন্দুস্থানের বাদশাহ বলে ঘোষণা করব। তার আগে নয়।

—খুবই যুক্তিপূর্ণ কথা। আমাকে তাহলে আপনার শিবির পরিত্যাগের অনুমতি দিন।

তাহেবর বলে—আমরা যদি রাণাকে পৃথকভাবে দূত পাঠাই, আপনার আপত্তি আছে ?

—না। কোন আপত্তি নেই। বরং ভালই হয়। এতে মহারাণা গুরুত্ব বুঝতে পারবেন।

এদিকে দুর্গাদাস যখন মুঘল-শিবিরে আলোচনারত সেই সময় পৃথ্বী সিং বীরেন্দ্র সিং-এর বাসভবনে জনদশেক রাঠোরের সঙ্গে বসে ঠাট্টা তামাশা করলেও মনে তার প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয়েছিল। বেচারা করিমবক্স দেড়দিন না খেয়ে রয়েছে। খাদ্য না পেলে হয়ত অতটা এসে যাবে না। কিন্তু পানীয় জলের প্রয়োজন। তৃষ্ণায় হয়ত সে ছটফট করছে। কিংবা অচেতন হয়ে পড়ে থাকতে পারে। তার মনে সেই পুরানো দ্বিধা। এবারও কি দুর্গাদাস তার কাজকে মানবিকতার দোহাই দিয়ে ক্ষমা করবেন ?

তেজ সিং অনেকক্ষণ থেকে পৃথ্বী সিং-এর চালচলন লক্ষ্য করছিল। এক সময় সে বলে—তোমার হাতের ব্যথায় কি কষ্ট পাচ্ছ ?

—না তো ?

—তবে অমন করছ কেন ?

—কী করছি ?

—কেমন চঞ্চল যেন। তুমি তো অমন নও ?

—ভুল দেখছ।

—মোটেই না। হাসতে হয় তাই হাসছ। কথা বলতে হয় তাই বলছ।

অপ্রস্তুত পৃথ্বী বলে ওঠে—ভাবছি লক্ষ্মণ সিং বাঁচবে তো ?

—বিপদ কেটে গিয়েছে।

—কি জানি ?

দুর্গাদাস ফিরে আসেন অপরাহ্নে। এসেই দুইজন অশ্বারোহীকে দূত হিসাবে পাঠিয়ে দেন মেবারের রাণার কাছে আকবরের সঙ্গে আলোচনার ফলাফল জানিয়ে।

তারা চলে গেলে দুর্গাদাস বলেন—কাজ শেষ। এবারে আমাদেরও রওনা হতে হবে। এখানে থাকা একটুও নিরাপদ নয়। এখানে প্রায় সবাই বাদশাহের অনুগত। তারা জানতে পারলে মুশকিল। ছদ্মনামে ছদ্মবেশে তাই আকবরের শিবিরে যেতে হয়েছিল।

পৃথ্বী সিং অতি কষ্টে বলে—বীরেন্দ্র সিং-এর যদি কোন বিপদ হয়?

—সে কথাও ভেবেছি। কিন্তু যারা জানত, তারা কেউ জীবিত নেই মনে হয়।

তেজ সিং বলে—একজন রয়েছে। সে নিশ্চয় গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে।

দুর্গাদাস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চেয়ে বলেন—তুমি ঠিক বলছ?

—হ্যাঁ, আমি নিজে চোখে দেখেছি পাঁচজনকে এগিয়ে আসতে। শুধু আমি কেন, পৃথ্বী সিংও দেখেছে।

—পৃথ্বী সিং?

—হ্যাঁ। পাঁচজনই ছিল।

—কিন্তু তারা সবাই যে ভেতরে ঢুকেছিল, তার প্রমাণ আছে?

হঠাৎ তেজ সিং উঠে দাঁড়িয়ে বলে—একটা কথা এতক্ষণ খেয়াল হয়নি। এ-বাড়িতে কতগুলো ঘোড়া আছে গুণলেই তো হয়। বোঝা যাবে সেই হারানো ব্যক্তিটি সত্যিই এসেছিল কিনা।

পৃথ্বীর চুপ্‌সে যাওয়া মুখ কেউ লক্ষ্য করে না।

তেজ সিং নিজেই ছুটে যায়। একটু পরেই উত্তেজিত হয়ে এসে বলে—কোথায় গেল সে?

দুর্গাদাস বলেন—কে ? কার কথা বলছ ?

—যে মুঘলটি এ-বাড়িতে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু বার হয়ে যাবার প্রমাণ নেই ?

—পরিষ্কার করে বল তেজ।

—ঘোড়াগুলো গুনে এলাম। তোমরা যে-কজন এসেছ সবার ঘোড়া আছে। আমার আর পৃথ্বীর ঘোড়াও রয়েছে। আমরা যেদিন এখানে আসি সেদিন থেকে একটা ঘোড়া দেখে এসেছি। সেটিও আছে। এছাড়াও রয়েছে পাঁচটি ঘোড়া।

—পাঁচটি ? গুনতে ভুল হয়নি তো ?

—তিনবার গুনেছি।

পৃথ্বীর দিকে চেয়ে দুর্গাদাস বলেন—তোমার কি মনে হয় পৃথ্বী ?

—মনে হয়, লোকটি কোন ভাবে টের পেয়েছিল আপনারা আসছেন। তাই পায়ে হেঁটে সরে পড়েছে।

—হতে পারে। অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমরা নীরবে আসিনি। পৃথ্বী যাতে জানতে পারে সেই জন্যে তেজকে চিৎকার করতে বলেছিলাম। যদিও পৃথ্বীকে জীবিত দেখব ভাবিনি।

পৃথ্বী মনে মনে প্রার্থনা করে, তেজ সিং-এর যেন সেই গুপ্তপথ আর চোরা কুঠরীর কথা মনে না পড়ে। তেজ সিং যেভাবে চেয়ে রয়েছে তার দিকে তাতে মনে হয়, তার মনে পড়েছে ও দুটোর কথা। কিন্তু তার পরেই তার দৃষ্টি কোমল হয় একটু। বোধহয় বুঝতে পারে, এটা অসম্ভব। বাইরের মানুষ কখনই ওগুলোর সন্ধান পেতে পারে না।

একটু সময় দিয়ে পৃথ্বী নিখোঁজ মুঘলের প্রসঙ্গ পরিবর্তনের আশায় বলে—আপনি যদি অনুমতি করেন, আমি কিছুদিন এখানে থেকে যেতে পারি।

—তুমি ? একা ?

—হ্যাঁ। এভাবে বীরেন্দ্র সিংকে বিপদের মধ্যে ফেলে যাওয়া

উচিত হবে না। আমাদের জন্যে এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর প্রাণ সংশয় হোক সেটা কি ঠিক ?

—না। কিন্তু ইতিমধ্যেই তুমি যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছ। আর নয়।

পৃথ্বী সিং দুর্গাদাসের পায়ের কাছে বসে পড়ে আকুতি জানায়। এতে দুর্গাদাস খুবই বিস্মিত হন। বিচলিত না হয়ে পারেন না। বলেন—তবে তেজ সিংও তোমার সঙ্গে থাক।

—না। আমি একা থাকব। মুঘল সেনা এখানকার শিবির গুটিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে গিয়ে উপস্থিত হব।

—বেশ।

তেজ সিং সঙ্গে সঙ্গে বলে—তাহলে আমিও থাকব। আমি পৃথ্বী সিং-এর অধীনে এসেছি। সে আমার নেতা। তাকে ছেড়ে যেতে পারি না।

পৃথ্বী বলে—আমাদের সবার দলপতি এখন এখানে উপস্থিত। তাঁর কথামত চলতে তুমি বাধ্য। নইলে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে পড়বে।

দুর্গাদাস হেসে বলেন—পৃথ্বী ঠিক বলেছে তেজ! তুমি আমাদের সঙ্গে চল। আমাদের আসল কাজ এইবার শুরু হবে।

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুর্গাদাসের সঙ্গে অনিচ্ছুক তেজ সিংও রওনা হয়ে যায়। পড়ে থাকে একা পৃথ্বী সিং। সে ছুটে প্রাসাদ শীর্ষে গিয়ে দাঁড়ায়। সেখান থেকে দেখতে পায় দুর্গাদাস দলবল নিয়ে এগিয়ে চলেছেন ধূলোর কুণ্ডলীর মধ্যে। সঙ্গে রয়েছে বাড়তি পাঁচটি সতেজ ঘোড়া। পৃথ্বী দেখতে থাকে। একসময় দলটি দূরের পাহাড়ের গায়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পৃথ্বী নিশ্চিন্তে নীচে নামে। বীরেন্দ্র সিং-এর কক্ষে প্রবেশ করে। সেদিনের ঘটনার পর বীরেন্দ্র সিং-এর শরীর ভাল যাচ্ছে না। শুয়েই দিন কাটছে।

বীরেন্দ্র সিং বলেন—তুমিও চলে যেতে পারতে পৃথ্বী। লক্ষ্মণ অসুস্থ হলেও আমাকে দেখাশোনার লোক তো রয়েছে।

— তারা ? সেদিন লক্ষ্মণের মত কেউ তো এগিয়ে এলো না। তাদের ভরসা কোথায় ? শুনেছি লুকিয়ে ছিল।

— ভুল করছ তুমি। সবাই লক্ষ্মণ হতে পারে না।

— আমি আর অন্তত দিন দুয়েক থাকব।

আসলে পৃথ্বী সিং বীরেন্দ্র সিং সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে চায়। করিমবক্স মুক্তি পেয়ে বীরেন্দ্র সিং-এর ওপর প্রতিশোধ নেবে কিনা জানা নেই।

পৃথ্বী বীরেন্দ্র সিং-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লক্ষ্মণ সিং-এর কক্ষে প্রবেশ করে।

— কেমন আছ লক্ষ্মণ ?'

— ভাল। এ-যাত্রা বেঁচে গেলাম মনে হচ্ছে। কিন্তু তুমি চলে গেলে পারতে।

— যাব। কদিন বাদেই চলে যাব। হয়ত আর দেখাই হবে না জীবনে। অত অসহিষ্ণু হচ্ছ কেন আমার জন্যে ?

— অসহিষ্ণু ? না না ওকথা বলোনা। আসলে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে।

— সঙ্কোচ তোমার চেয়ে আমার অনেক বেশী ! আমাদের জন্যেই এই বিপদ ঘটল। নইলে বেশ তো শান্তিতে ছিলে। বৃদ্ধ বয়সে এই চোট খেতে হতো না।

— এটা কোন যুক্তি নয়।

— ঠিক আছে। আমি চলে যাব। অসুস্থ অবস্থায় তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না।

পৃথ্বী এরপরে একটা বাতি সংগ্রহ করে। একটি পাত্রে জল নেয়। তারপর সাবধানে এগিয়ে যায় চোরা-কুঠুরীর দিকে। এই প্রাসাদে আরও চারটি প্রাণী রয়েছে। তার মধ্যে দুটি মানুষ আর বাকী দুটি অশ্ব। মানুষ দুটি সাধারণত ওপরে আসে না। তবে লক্ষ্মণ সিং অসুস্থ বলে মাঝে মাঝে এসে পড়ে।

পৃথ্বী গুপ্ত-কক্ষের সামনে এসে দাঁড়ায়। বাতি ও জলপাত্র রেখে কপাট খুলে ফেলে। একটু অপেক্ষা করে, তারপর বাতি হাতে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে।

পাষাণের ওপর শুয়ে রয়েছে করিমবক্স—ঠিক তার গাঁয়ের কুটিরে অসুস্থ অবস্থায় যেভাবে শুয়ে থাকত।

পৃথ্বীকে দেখে ধীরে ধীরে উঠে বসে ফ্যাস্‌ফেঁসে কণ্ঠে বলে—একটু পানি।

তাড়াতাড়ি জলপাত্র নিয়ে এসে তার সামনে ধরে পৃথ্বী।

করিমবক্স অনেকক্ষণ ধরে একটু একটু করে জল পান করে। তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পৃথ্বীর দিকে চেয়ে বলে—তুমি জানতে আমি তৃষ্ণার্ত ?

—স্বাভাবিক।

—তোমাকে ধন্যবাদ।

আবার সেই সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ে যায় পৃথ্বীর। সেই কৃতজ্ঞতা বোধ। তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে, করিমবক্সের কাছে যা রহস্যাবৃত বলে মনে হয়।

—এবারে আমায় নিয়ে কি করবে পৃথ্বী সিং ?

—তাই ভাবছি।

—এতে ভাববার কিছু আছে কি ?

—আছে বৈকি ? আমি তোমাকে এভাবে লুকিয়ে রেখেছি সেকথা দুর্গাদাসও না জেনে এখান থেকে চলে গিয়েছেন। তাঁর কাছেও তোমার কথা গোপন রেখেছি। তোমার কি মনে হয় ? আমি বিশ্বাস-ঘাতক নই ?

—আলবৎ বিশ্বাসঘাতক। তাঁকে বলাই ছিল তোমার কর্তব্য।

—কিন্তু বললে, তোমার অবস্থা তোমার সঙ্গীদের মত হতো।

—তারা সবাই মৃত ?

—হ্যাঁ।

করিমবক্স কিছুক্ষণ কপালে হাত রাখে। তারপর বলে—তবু কর্তব্য হিসাবে তোমার বলা উচিত ছিল। আমি হলে গোপন করতাম না।

—আমি পারিনি। তোমার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে নিশ্চয় পারতাম। তোমাব সঙ্গে আমি যুদ্ধ করলেও এমন হতো না। কিন্তু হঠাৎ এই দুর্বলতা আমাকে পেয়ে বসল।

—তোমার অবস্থা আমি বুঝতে পারছি পৃথ্বী সিং। আমি দুঃখিত!

করিমবক্সের কাছে অস্ত্র আছে। সে জানে না, এই বিশাল পুরীতে তারা দুজনাই শুধু অস্ত্রসজ্জিত। জানলে এতক্ষণে হয়ত আক্রমণ করে বসত। সন্ন্যাসী বলেছিলেন, এর সঙ্গে বার চারেক দেখা হবে। দু-বার তো হয়ে গেল। আব দু'বার বাকী। শেষ পর্যন্ত কপালে কি আছে কে জানে।

—করিমবক্স, আমার সঙ্গে তোমার সেই চুক্তির কথা মনে আছে?

—হ্যাঁ! ভুলব কেন? কিন্তু সেকথা এখন কেন?

—সেই ধবণের আর একটা চুক্তি আজ করতে চাই।

—কেন?

—তাহলে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি।

হেসে করিমবক্স বলে—বাদশাহজাদা আকববকে হত্যা করতে হবে?

—হাসির কথা নয়। সত্যিই একটা চুক্তি কবতে চাই।

করিমবক্স জানে, তার মুক্তি, তার জীবন পৃথ্বীর হাতের মুঠোয়। মুক্তির চেয়ে সুখ আর কিসে আছে?

সে বলে—কারও কোন ক্ষতি না হলে আমি রাজী।

—সুন্দর বলেছ। কারও কোন ক্ষতি না হবার জন্যই এই চুক্তি।

—বল।

— আমরা আজই চলে যাব। তোমায় কথা দিতে হবে, এই বাড়িতে যে বৃদ্ধ থাকেন. আমরা চলে যাবার পরে, তাঁর আর তাঁর লোকজনদের কোন ক্ষতি না হয়।

— কিন্তু এরা তোমায় লুকিয়ে রেখে আমাদের ওপর নজর রাখতে সাহায্য করেছে।

— কিছুটা সত্যি। কিন্তু সবটুকু জানলে, একথা বলতে পারতে না।

— বল সবটুকু।

— না। এখন সময় নেই। তুমি নিজেই পরে জানতে পারবে।

— দুর্গাদাস কেন এসেছিলেন ?

— সেকথা বলতে পারব না। তবে তাঁর আসার পথ নিরাপদ রাখতেই আমরা এসেছিলাম।

— মুঘলদের কোন ক্ষতি হয়েছে ?

— কিছুমাত্র না।

— আমি চুক্তিতে রাজী। এদের কোন ক্ষতি আমি করব না। বরং দেখব যাতে কেউ ক্ষতি না করতে পারে এদের।

হেসে পৃথ্বী বলে — তুমি মুক্ত।

— চমৎকার বলেছ। বাইরে বার হলেই আমাকে হত্যা করা হবে।

— তাহলে তোমার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতাম না।

করিমবক্স তার অসিতে হাত রেখে বলে — সবাই চলে গিয়েছে !

— হাত নামাও। অত অধৈর্য হয়ো না। তোমাকে ওদের সামনে দিয়ে যাতে না যেতে হয়, সেই ব্যবস্থা আমি করছি।

— আমি জানি এই বাড়িতে মাত্র একটি ফটক।

— করিমবক্স যা জানে, সবই সত্যি হতে হবে এমন কোন কথা নেই। কতদিন ধরে আমাদের ওপর নজর রাখছিলে ?

— নজর রেখেছিল আর একজন। সে তোমাকে চেনেনা।

আমিও জানতাম না তুমি রয়েছ এখানে। বাজারে তোমাকে দেখেই আমি আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। ভাবলাম, একটা বিপদ শিগ্গিরই ঘটতে পারে।

—শোন। ফটক একটাই। কিন্তু অন্য পথ রয়েছে।

—আশ্চর্য!

—হ্যাঁ। তুমি যখন প্রাসাদে ঢুকছিলে, তখন সেই পথেই তেজ সিংকে বার করে দিয়েছিলাম। একটু যেতেই দুর্গাদাসের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। তুমি এখন সেই পথেই যাবে, তবে বাহনটি পাবে না।

—সত্যিই মুক্তি দেবে আমায়?

—হ্যাঁ করিমবক্স।

—দুবার হলো।

—আরও দুবার নাকি দেখা হবে তোমার সঙ্গে।

—তার মানে?

—এক সন্ন্যাসী বলেছেন। তোমার সঙ্গে দেখা হবার আগেই তিনি বলেছিলেন। তিনি আর একটা কথা বলেছিলেন।

—কী কথা?

পৃথ্বী হেসে ফেলে বলে—সেকথা শুনে আর কাজ নেই। বড় বড় নীতির কথা, মনুষ্যত্বের কথা। তুমি বিশ্বস্ত সৈনিক। ওসব নীতি-টিতি মেনে চলা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—আর তুমি? বিশ্বস্ত নও?

—দেখতেই পাচ্ছ। চল।

পৃথ্বী পাশের আর একটি কপাট খুলে ফেলে। গভীর অন্ধকারের মধ্যে সামনের একটি দুটি সিঁড়ি মাত্র দৃষ্টিগোচর হয় বাতির আলোয়।

করিমবক্স থমকে দাঁড়ায়। বলে—প্রাসাদটির এত গুণ আগে জানতাম না। জানলে বাদশাহজাদাকে এখানে থাকতে বলতাম।

—দেরী কারো না করিমবক্স। চলে যাও।

কপাট বন্ধ করেই পৃথ্বী বুঝতে পারে, আজ না হোক কাল করিমবক্স এ-বাড়ির দিকে আসবেই। সে নিশ্চিন্ত হতে চাইবে, দুর্গাদাস চলে গিয়েছে কিনা। এর মধ্যে তাকে বিদায় নিতে হবে। সে আবার বীরেন্দ্র সিং-এর কক্ষে প্রবেশ করে।

অন্ধকারে শুয়ে ছিল বৃদ্ধ। তাকে দেখে বলে – তোমার কথাই ভাবছিলাম। আমার মনে হয় তোমার চলে যাওয়া উচিত। শুধু আমার জন্যে আটকে থাকার কোন অর্থ নেই। দুর্গাদাসের কাছে তোমার প্রয়োজন অনেক বেশী। তাছাড়া মুঘলরা আমার ক্ষতি করতে চাইলে তুমি একা কিছু করতে পারবে না। একজন বৃদ্ধের জন্যে তোমার অমূল্য জীবন নষ্ট হতে দিতে চাইনা।

পৃথ্বী নিশ্চিন্ত হয়। সে বলে – বেশ, আপনার উপদেশ গ্রহণ করলাম। আমি শেষ রাত্রের দিকে রওনা হব।

সেদিন রাতের দুই প্রহর বাকী থাকতে নন্দিনীর পিঠে হাত রেখে পৃথ্বী বলে – যথেষ্ট বিশ্রাম করেছিস্। এবারে চল্।

নিঃশব্দে ফটক খুলে দেয় একজন। পৃথ্বী বার হয়ে পড়ে।

সে যখন একদিন পরে অনেকটা পথ পার হয়ে গিয়েছে – একটা প্রান্তর অতিক্রম করছে যখন সে তখন জ্যৈষ্ঠের তপ্ত মধ্যাহ্নে উঠল ঘূর্ণীঝড়। অশ্বের রাশ টেনে ধরে দূর দিগন্তের দিকে দৃষ্টি মেলে দেখল বালির ঝড় ঘুরতে ঘুরতে তারই দিকে ধেয়ে আসছে।

– শিগগির চল্ নন্দিনী – ওই ছোট্ট পাহাড়টার আড়ালে চল্।

প্রকৃতির এই ঘূর্ণীঝড়ে পৃথ্বী যখন বিচলিত, ঠিক তখন করিমবক্সের জীবনে উঠেছে আর এক ঘূর্ণীঝড়। সেই মুহূর্তে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে শাহজাদা আকবরের সম্মুখে। তাহেবর খাঁও সেখানে উপস্থিত। আকবরের মুখ ক্রোধে আরক্ত। সে আগেই শুনেছিল অশ্বারোহীদলের অধিপতি হিসাবে করিমবক্সের ব্যর্থতা। তেমন ব্যর্থতা সবার জীবনেই আসে। কিন্তু আজকের ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। বীরেন্দ্র সিং-এর প্রাসাদে যাওয়ার আগে করিমবক্স তাহেবর খাঁকে

কিছু জানায় নি। অথচ সঙ্গে নিয়েছিল কয়জন দক্ষ যোদ্ধা যাদের একজন আবার খোদ তাহেবর খাঁয়ের নিকট আত্মীয়। সেই চারজনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে সোজাতের এক পরিত্যক্ত প্রান্তরে। সবাই ভেবেছিল করিমবক্সও ওদের সঙ্গে নিহত হয়েছে। কিন্তু সে যখন ফিরে এল তখন সবার দৃষ্টিতে বিভ্রম।

সর্বপ্রথম তাহেবর খাঁ নিজের পদমর্যাদা ভুলে ছুটে এসেছিল। বলেছিল—কোথায় ছিলে তুমি?

—বন্দী করে রেখেছিল।

—জানি। বন্দী হয়ে থাকতে তুমি খুবই পছন্দ কর। কিন্তু কোথায় ছিলে বন্দী হয়ে?

করিমবক্স মুহূর্তের মধ্যে মনে মনে স্থির করে নেয়, বীরেন্দ্র সিং-এর প্রাসাদের কথা সে কিছুতেই বলবে না। তাতে চুক্তিভঙ্গ হবে। কারণ ক্ষিপ্ত হয়ে তাহেবর নিজেই ছুটে গিয়ে সেই বৃদ্ধকে খুন করবে। তারপর ওই বাড়ির সব কিছু ধ্বংস করে ফেলবে।

সে মেপে মেপে বলে—দূরের পাহাড়ে।

—দূরের পাহাড়ে? মিথ্যেবাদী।

—না। মিথ্যা নয়।

—সঙ্গে করে যাদের নিয়ে গিয়েছিলে, তারা কোথায়?

—সবাই এক সঙ্গে বন্দী হয়েছিলাম। আমাদের আলাদাভাবে রাখা হয়েছিল। ওরা কোথায় আমি জানিনা। দুদিন পরে সুযোগ পেয়ে আমি পালিয়ে আসি।

সাধারণ সৈনিক হলে তাহেবর খাঁ তখনি তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলত। কিন্তু করিমবক্স মোটেই সাধারণ নয়। বরং স্বয়ং বাদশাহ তার অসাধারণত্বের প্রশংসা করেছেন এক সময়ে।

নিজেকে অতি কষ্টে সংযত করে তাহেবর খাঁ বলে—কাল দ্বিপ্রহরে বাদশাজাদা স্বয়ং তোমার বিচার করবেন। ততক্ষণ তুমি বন্দী। এই অবস্থাটা তোমার খুব পছন্দ।

তাকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় একটি শিবিরে ফেলে রাখা হয় সারারাত। সামান্য খাদ্য ও পানীয় অবশ্য দেওয়া হয়েছিল। পরদিন মধ্যাহ্নের কিছু আগে নিদ্রা থেকে উঠেই বাদশাহজাদা হুকুম করলেন, বন্দীকে উপস্থিত করতে।

আকবর শুরুতেই বলে – করিমবক্স, কিছুদিন থেকে তুমি অপদার্থ হয়ে গিয়েছ। স্বীকার কর ?

– আমি সব সময় আপনার অনুগত। কর্তব্য কর্ম সাধ্যমত সম্পন্ন করার চেষ্টা করি।

– বিশ্বাস করিনা।

– আমি হতভাগ্য। পরপর দুবারের ব্যর্থতা আপনার মনে সংশয়ের সৃষ্টি করেছে।

চিৎকার করে আকবর বলে – না – না।

করিমবক্স নীরব।

– তোমার ওপর আমার কিছুমাত্র আস্থা নেই। অপদার্থকে সহ্য করা যায়। কিন্তু বিশ্বাসঘাতককে নয়।

– খোদাতায়লার নামে শপথ করে বলছি আমি বিশ্বাসঘাতক নই।

– চুপ্ কর। তুমি আমার শ্রেষ্ঠ চারজন অশ্বারোহীকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের খুন করেছ।

– আমি –

আকবর লাফিয়ে ওঠে। তারপর এগিয়ে এসে তাকে পদাঘাত করে। সেই পদাঘাতের এমন কিছু শক্তি ছিল না। কিন্তু অপমানিত করিমবক্সের মাথার মধ্যে ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। স্বয়ং আওরঙজেব তাকে পদাঘাত করবেন, একথাও সে কল্পনা করতে পারে না। তিনি হলে বরং তাকে হত্যা করার হুকুম দিতেন।

– তোমাকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিতে চেয়েছিলাম ! কিন্তু তাহেবর খাঁয়ের অনুরোধে প্রাণে বেঁচে গেলে। এই মুহূর্তে তুমি সোজাত

ছেড়ে চলে যাও। ইচ্ছে করলে আজমীঢ়ে যেতে পার। কিন্তু এখানে এক মুহূর্তও নয়। যাও—

করিমবক্স অভিবাদন জানিয়ে বাইরে চলে আসে। তার মন দুঃখের পরিবর্তে আনন্দে ভরে ওঠে। কিছুদিন থেকে সে লক্ষ্য করছিল তাহেবর খাঁ ধীরে ধীবে আকবরকে গ্রাস করে ফেলছে। যুদ্ধে কারও তেমন গা নেই। যে তাহেবর এককালে যুদ্ধে ছিল দুর্দান্ত, এখন সে কেন যেন যুদ্ধকে বর্জন করে চলতে চায়। সেনাদলে ঘোর বিশৃঙ্খলা। চারদিকে শুধু ফিস্‌ফিসানি। একটা অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবে, এইরকম জল্পনা-কল্পনা। সৈন্যরা কাজ না পেয়ে দলে দলে আশপাশের এলাকার ওপর চড়াও হয়ে লুটপাট আর নানান্ ধরণের ঘৃণ্য অত্যাচারে লিপ্ত। নিষ্কর্মা জীবনে তারা এইভাবে বৈচিত্র্য খুঁজে বেড়ায়। এর চেয়ে বাদশাহ আওরঙজেবের কাছে গিয়ে সে শান্তি পাবে। সেখানে শুধু কাজ। আলস্যের স্থান সেখানে নেই। আর সে নিজে আলস্যকে ঘৃণা করে।

তার কিছু বন্ধু রয়েছে এখানে। কিন্তু কারও সঙ্গে দেখা করার প্রবৃত্তি হলো না। ঘোড়া নিয়ে সেই মুহূর্তে মুঘল শিবির পরিত্যাগ করে। সামনে অনেকটা পথ।

পৃথ্বীর সঙ্গে চুক্তির কথা মনে পড়ে যায় করিমবক্সের। বীরেন্দ্র সিং-এর যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেটা দেখতে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অথচ এখানে থাকার উপায় নেই। তবু যাওয়ার আগে সেই বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ফটক খোলা। একজন লোক তাকে দেখে চমকে ওঠে। মুখে আতঙ্কের চিহ্ন ফুটে ওঠে।

করিমবক্স তাকে কাছে ডাকে। সে ভয়ে ভয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ায়।

—ভয়ের কিছু নেই। আমি একা এসেছি। বীরেন্দ্র সিং-এর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

লোকটা কি জবাব দেবে ভেবে পায় না। লক্ষ্মণ সিং সুস্থ থাকলে

বড় ভাল হতো। কেন যে ফটক খোলা রাখতে গিয়েছিল।

সে বলে — আমি গিয়ে জেনে আসছি।

— হ্যাঁ। তাই এসো। আমি অপেক্ষা করছি।

বীরেন্দ্র সিং একজন মুঘল সেনাপতি এসেছে শুনে হতাশ হয়। পেছনে আরও কত লোক আসছে কে জানে। পৃথ্বীকে বিদায় দিয়ে ভালই হয়েছে। মরলে একা মরাই ভাল। এই বয়সে মৃত্যুতে কারও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। মুঘলকে ডেকে আনতে বলে সে।

করিমবক্স এসে নম্রভাবে অভিবাদন জানায়। বীরেন্দ্র সিং-এর চোখে অবিশ্বাস।

করিমবক্স বলে — আমি পৃথ্বী সিং-এর কাছে আপনার নিরাপত্তার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

— পৃথ্বী সিং? আপনি মুঘল নন?

— হ্যাঁ মুঘলই। দেখে কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে?

— না। সেই জন্যই বিস্মিত হচ্ছি। পৃথ্বীর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ কি করে সম্ভব?

— সেই কথাই বলছি।

বীরেন্দ্র সিং চোখ বড় বড় করে সেদিনের সমস্ত ঘটনার কথা শুনে যায়। এই লোকটিই সেদিন এসেছিল। আশ্চর্য! করিমবক্স বলে চলে কীভাবে সেদিন পৃথ্বী তাকে বাঁচিয়েছিল। বীরেন্দ্র সিং-এর মনে হয়, সে যেন অদ্ভুত এক গল্প শুনছে।

শেষে করিমবক্স বলে — আপনার কোন ভয় নেই। শুধু আপনার বাড়ির সকলকে বলে দেবেন, তারা যেন কখনো সেদিনের মুঘল আক্রমণের কথা এখানকার কাউকে না বলে। বললে আপনার রক্ষা নেই।

— আমি এখনি ব্যবস্থা করছি। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

— পৃথ্বীর মঙ্গল কামনা করুন বরং। কারণ সে আমায় চুক্তিবদ্ধ করে রেখেছে।

– সে অসাধারণ। তাই সে প্রথমে থাকতে চেয়েও পরে চলে গেল। এখন বুঝতে পারছি আপনাকে মুক্ত করার জন্য সে অপেক্ষা করছিল।

–মনে মনে সে একটা আক্ষেপ নিয়ে গিয়েছে। দুর্গাদাসের কাছে আমার কথা গোপন রাখায় নিজেকে বিশ্বাসঘাতক ভেবে কষ্ট পাচ্ছে।

–সব দিক বিচার করলে তাকে তো বিশ্বাসঘাতক বলা যায় না।

করিমবক্স বিদায় নেয়। বীরেন্দ্র সিং বুঝতে পারে না, আকবরের সঙ্গে দুর্গাদাসের গোপন সাক্ষাতের কথা করিমবক্স জানে কিনা। তাকে এ সম্বন্ধে করিমবক্স কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। করলেও সে বলত না। হয়ত চুক্তিবদ্ধ থাকার জন্য এ প্রশ্ন সে এড়িয়ে গিয়েছে।

পৃথ্বী যখন তার গাঁয়ে পৌঁছোলো, তখন সন্ধ্যা। অনেকদিন পরে মাকে দেখবে, দেখবে রুক্মিণীকে। মা কেমন আছেন? রুক্মিণীই বা কেমন আছে? ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে চলতে থাকে সে। রাতটুকু গ্রামে থেকে কালই রওনা হতে হবে দুর্গাদাসের সঙ্গে দেখা করার জন্য। কিছুদিনের মধ্যেই এগিয়ে যাবে রাঠোর বাহিনী। এখন সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত নিশ্চয় দুর্গাদাস। ওদিক থেকে এগিয়ে আসবে মেবার বাহিনী। সেই সঙ্গে আকবরের সৈন্যদল। সব ঠিকমত চললে একটা বিরাট পরিবর্তনের পূর্বাভাষ।

শিমূলতলার কাছাকাছি আসতেই রুক্মিণীদের বাড়ির ভেতর থেকে একটা বাতি ছুটে আসে রাস্তার ওপর। ঠিক শুনতে পেয়েছে রুক্মিণী নন্দিনীর পরিচিত পায়ের শব্দ। বাঁধন-ছেঁড়া আনন্দে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটে গিয়ে রুক্মিণীকে জড়িয়ে ধরে পৃথ্বী। তারপরই খেয়াল হয় এইভাবে আগে কখনো রুক্মিণীকে স্পর্শ করেনি। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ায়।

অবাক রুক্মিণী একটু চেয়ে থেকে বলে—খুব বীরপুরুষ হয়েছ, তাই না ?

—না। হঠাৎ হয়ে গেল। তুমি রাগ করলে রুক্মিণী ?

—করেছি তো। প্রদীপের আগুন লাগত যদি ?

বোকা পৃথ্বী মুখ তুলতে পারে না। তাড়াতাড়ি চলে যাবার জন্য পেছন ফেরে।

রুক্মিণী তার হাত চেপে ধরে বলে—কোথায় চললে ?

—বাড়ি।

—অমনি রাগ হয়ে গেল ?

—আমার ? আমার রাগ হবে কেন ? তোমার হয়েছে। হওয়াই উচিত।

—মোটেই রাগ হয়নি মশায়। খুব আনন্দ হয়েছে।

পৃথ্বী আবার একই অন্যায় করে বসে। রুক্মিণীকে চেপে ধরে বলে —ঠিক কথা বলছ ? সত্যি রাগ করোনি ?

—আবার পাগলামি হচ্ছে ? কেউ দেখে ফেলবে।

—ঠিক বলেছ। জান রুক্মিণী, সোজাতে অনেক সব ব্যাপার হয়েছে। শুনবে ?

—এখন ? তুমি এখনো বাড়ি যাওনি। মুখ শুকিয়ে রয়েছে। এখন তোমার বীরত্ব শোনার সময় ?

—কিন্তু আমাকে যে কাল সকালেই চলে যেতে হবে। কবে ফিরব ঠিক নেই। এবার শুরু হবে আসল যুদ্ধ।

আসল যুদ্ধের অর্থ কি রুক্মিণী ভালভাবেই জানে। তার ঝলমলে মুখ নিমেষে ম্লান হয়ে যায়। এত তাড়াতাড়ি ? তার প্রবল ইচ্ছা হয় পৃথ্বীকে ধরে রাখে। আর কখনো ছেড়ে দেবে না সে। আসল যুদ্ধ। রাজপুত রমণী এর অর্থ মর্মে মর্মে পুরুষানুক্রমে জেনে এসেছে। আসল যুদ্ধের মানে, যে পুত্র বা স্বামী হাসতে হাসতে বিদায় নেয়, তাদের অনেকে আর কখনো ফেরেনা। তার নিজের ঠাকুর্দা আর

ফেরেনি। পৃথ্বীর বাবাও পড়ে ছিলেন রক্তাক্ত প্রান্তরে। রাঠোর বীরদের কয়জনাই বা গৃহের শান্ত পরিবেশে প্রিয়জনদের সামনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারে ? যারা পারে, তারা অক্ষম কিংবা অসুস্থ। অথবা ভাগ্যচক্র মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তাদের আত্মীয় পরিজনদের নিকটে এনে ফেলে।

রুক্মিণীর চোখ ছলছল্ করে। পৃথ্বী তার চোখের জল দেখতে পাবে ভেবেই হয়ত দম্‌কা হাওয়া এসে বাতিটা নিভিয়ে দেয়।

পৃথ্বীর দুহাত চেপে ধরে তাকে গাছের গোড়ায় বসিয়ে তার কোলের ওপর ভর দিয়ে রুক্মিণী বলে—বল। তোমার সব কথা শুনব। তোমার হাতে চোট লেগেছে দেখছি ?

—হ্যাঁ, করিমবক্সের তলোয়ারের চোট। ভাগ্যক্রমে খুব বেশী হয়নি।

—কী বললে ! সেই করিমবক্স ! আবার ?

—হ্যাঁ।

—সে পারল তোমাকে আক্রমণ করতে ?

—না পারার কি আছে ? দেশের কাছে, আনুগত্যের কাছে এইসব ব্যক্তিগত ব্যাপার কিছু নয় রুক্মিণী।

—কী জানি।

দূরে পাহাড়ের বুকে দাবানল জ্বলে ওঠে। শিমূলগাছের ডালের ফাঁক দিয়ে চাঁদ দেখা যায়। দমকা হাওয়া মাঝে মাঝে ধেয়ে আসছে প্রান্তর থেকে। নন্দিনী ছট্‌ফট্ করছে। অনেকক্ষণ তার পেটে দানা-পানি পড়েনি। সোজাতে নিয়মিত আহার পেয়ে পেয়ে তার অভ্যাস খারাপ হয়ে গিয়েছে।

—জান রুক্মিণী, ঠিক সময়ে দুর্গাদাস গিয়ে না পৌঁছোলে, করিমবক্স আমাকে হত্যা করতে পারত।

—করিমবক্সের কি হল ?

—তাকে বন্দী করে রেখেছিলাম। কেউ জানতে পারেনি।

জানলে মেরে ফেলত তাকে। আমার কেমন মায়া হলো। মানুষটা খুব বড় যোদ্ধা। গোপনে ছেড়ে দিয়ে এসেছি। সে প্রতিজ্ঞা করেছে বীরেন্দ্র সিং-এর যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

—সে প্রতিজ্ঞার মূল্য দেবে?

পৃথ্বী নিশ্চিন্তে বলে—নিশ্চয়। মানুষকে দেখলে চেনা যায় না?

—তাই বলে দুর্গাদাসকে গোপন করলে?

—ওঁকে পরে গিয়ে বলব।

রুক্মিণী ভাবে, এবার পৃথ্বী নিশ্চয় ভুল করে ফেলেছে। তবু সে সাহস পায় না কিছু বলতে। আগেরবার প্রমাণ হয়েছে পৃথ্বী অন্যায় কিছু করেনি। স্বয়ং দুর্গাদাস তার ওপর বিশ্বাস করে নিজের পুত্রকে তার সঙ্গে সোজাত পাঠিয়েছিলেন। এরপর কিছু বলা ঠিক হবে না। তবু তার ভয় পৃথ্বীর গায়ে বুঝি কলঙ্কের ছাপ পড়ল। পৃথ্বীর সুনামই যে তার একমাত্র গর্ব এই পৃথিবীতে। সেটুকু গেলে যে সব গেল। কি নিয়ে চলবে সে দেশের মাটির ওপর? কিন্তু সে বুঝে ফেলেছে সমালোচক হওয়া খুব সহজ। যারা বাইরে কাজ করে নানান্ বাধা, নানান্ অসুবিধার মধ্যে তাদের কোন কাজ এক কথায় নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না। সেই শিক্ষাই সে পেয়েছে আগের বার।

পৃথ্বী বলে—আমি আজ চলি রুক্মিণী। এর পরে মা ঘুমিয়ে পড়বে।

—কাল কখন রওনা হবে?

—খুব ভোর বেলায়। তুমি জেগে বসে থেকোনা যেন।

—না। এবারে তুমি কতদিন পরে আসবে?

—বলতে পারিনা। অমর তোমার খোঁজ নেয় তো?

—হ্যাঁ। খুব কাজের। জানো, এবার তুমি ফিরে আসার পরে তোমাকে আমাদের গরুর দুধ খাওয়াব।

—এঁ্যা। তাই নাকি? অমর দারুণ কাজের লোক দেখছি।

রুক্মিণীর হাসি চাঁদের আলোয় সুন্দর দেখায়। কিন্তু সেই হাসি যে কত বিষণ্ণ বুঝতে পারে না পৃথ্বী। সে ধারণা করতে পারে না, রুক্মিণীর বুকের ভেতরে কতখানি বাষ্প জমে উঠেছে।

পরদিন ভোর হবার অনেক আগে মাকে প্রণাম করে পৃথ্বী যাত্রা সুরু করে। তখনো পাখীরা সুপ্ত। কিন্তু একটা ধূলিঝড় সুরু হয়েছে মধ্যরাত থেকে। মরুভূমির বালি দূর থেকে উড়ে আসছে। পৃথ্বী জানে দিনের আলো ফোটার পরেও নন্দিনীর অসুবিধা হবে পথ চলতে। যতটা দ্রুত গন্তব্যস্থলে যাবে ভেবেছিল, তার চেয়ে অনেক বিলম্বে পৌঁছবে সে।

সেই ঝড়ের মধ্যে রুক্মিণী দাঁড়িয়েছিল। পৃথ্বীর ভেতরটা ব্যথায় মুচড়ে ওঠে। তাড়াতাড়ি নেমে রুক্মিণীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।

তুজনার কেউ কোন কথা বলতে পারে না কিছুক্ষণ।

শেষে পৃথ্বী বলে—এভাবে আমাকে তুর্বল করে দাও কেন রুক্মিণী?

—তুমি এবারে আমাকে তোমার তলোয়ার এগিয়ে দেবে না? সেইজন্যে অপেক্ষা করছি।

মা ভুলে গিয়েছে এবারে। বৃদ্ধা হয়েছে। অত রাত্রে বাড়ি ফিরে সামান্য কয়েক প্রহর মাত্র ছিল সে। ঘুম হয়নি। বিশ্রাম হয়েছে কিছুটা। মা ঘুমিয়ে ছিল। সে ডেকে তুলতে তাকে আশীর্বাদ করেছে। কিন্তু তার তলোয়ার চুম্বন করেনি। তাছাড়া মা জানে না, এবারে সে সোজা যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যেতে পারে। তাকে রাতে কিছুই বলতে পারে নি সে। রুক্মিণী কথাটা মনে করায় ভালই হল। সে তার তলোয়ার কোষমুক্ত করে তু'হাতে রুক্মিণীর সামনে ধরে। রুক্মিণী সেটিকে গ্রহণ করে পুজোর নির্মাল্যের মত শ্রদ্ধায়। হাতে নিয়ে মাথায় স্পর্শ করে। তার চোখ সজল হয়ে ওঠে। ক্ষণিকের জন্য মনে হয় এই তলোয়ার নির্জীব নয় মোটেও। এটির প্রাণ আছে। মনে মনে বলে, ওকে রক্ষা করো তুমি। তারপর চুম্বন করে।

পৃথ্বী সেটিকে নিয়ে কোষবদ্ধ করে।

পাখীরা জেগে উঠতে সুরু করে। দিনের আলোর আভাষ পাওয়া যায় পূর্ব দিগন্তে।

—এবারে আসি রুক্মিণী।

—হ্যাঁ। এসো।

নন্দিনীকে নিয়ে কয়েক কদম এগিয়ে যেতেই বালির ঝড় তার আর রুক্মিণীর মধ্যে প্রাচীর তুলে ফেলে। কেউ আর দেখতে পায় না কাউকে। তাই পৃথ্বী জানতে পারে না, রুক্মিণী তার বুক চেপে ধরে ওইখানেই কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়ল।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে রুক্মিণী—ফিরে এসো পৃথ্বী। তুমি না ফিরলে আমি বাঁচব না।

দুর্গাদাসের কাছে পৌঁছোবার আগেই পৃথ্বী লক্ষ্য করে পথে অনেক লোকই চলছে। কেউ চলেছে পায়ে হেঁটে, কেউ ঘোড়ায়। সবার হাতে অস্ত্র। অনেক ধরণের অস্ত্রই দেখা যায়। ওদের কাছ থেকে জানতে পারে সে যে দুর্গাদাস রাঠোর জাতিকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাই এগিয়ে চলেছে তারা। কিন্তু দুর্গাদাসের সঠিক অবস্থান তাদের জানা নেই। একজন সন্ন্যাসী তাদের বলেছেন, দূরে ওই পাহাড়ে যেতে। তাই তারা চলেছে। পৃথ্বী জানে সন্ন্যাসী কে। পৃথ্বী ভাবে, তাদের গ্রামে যুবকের সংখ্যা খুবই কম। যারা রয়েছে, তারাও আর গ্রামে থাকে না। এখন রয়েছে কিছু শিশু আর বালক বালিকা। এত নিঃস্ব গ্রাম বোধহয় আর একটাও নেই। অথচ একপুরুষ আগে ছিল ভিন্ন রূপ। তার গ্রাম জানেই না দুর্গাদাসের আহ্বানের কথা। জানলে রুক্মিণী বলত। সেখানে দুর্গাদাস কোন লোক পাঠাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। অন্য সব গাঁয়ের লোকেরা কেমন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে চলেছে। দেখে মনে হচ্ছে তীর্থ দর্শনে চলেছে কিংবা পাহাড়ের ওপরে বসেছে কোন বৃহৎ মেলা—সেই মেলায়

যোগ দিতে চলেছে।

দুর্গাদাসের কাছে গিয়ে যখন সে হাজির হল, তখন গোধূলির আলো রাঙিয়ে তুলেছে সারা পৃথিবীকে। বালির ঝড় থেমে গিয়েছে। তাকে দেখে তেজ সিং ভ্রূকুঞ্চিত করে। এত তাড়াতাড়ি পৃথ্বীর প্রত্যাবর্তন খুবই অপ্রত্যাশিত। দুর্গাদাস সংযত। তাঁর মুখ দেখে মনের কথা বুঝতে পারা সম্ভব নয়। ইঙ্গিতে পৃথ্বীকে বসতে বলে অন্য সেনানায়কদের সঙ্গে তিনি তাঁর আলোচনা চালিয়ে যান।

তেজ সিং ইসারায় তাকে কাছে ডাকে। সে বলে—চলেই তো এলে। আমাদের সঙ্গে আসতে অসুবিধা কি ছিল?

—দরকার ছিল বলে আসতে পারিনি।

—কী দরকার?

—সে কথা সেদিন বললাম তো।

—না বলোনি।

পৃথ্বীর রাগ হয়। দুর্গাদাসের পুত্র হলেও তেজ সিং তার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। তাকে বড় বেশী দুর্বিনীত মনে হয়। অথচ কদিন আগেও এমন ছিল না। সে কি তবে তাকে সন্দেহ করে?

—শোন তেজ সিং, আমি কি বলব, না বলব সেটি নির্ভর করে আমার ওপর।

—হ্যাঁ। যদি তুমি খাঁটি মানুষ হও। যদি তোমার মধ্যে কোনরকম ছলনা না থাকে।

পৃথ্বী সিং ফুঁসে ওঠে—কি বলতে চাও তুমি?

—আমি বলতে চাই, তুমি কিছু লুকোতে চাইছিলে সেদিন। যে পৃথ্বী সিংকে দেখে আমি অভ্যস্ত, তোমার সেদিনের ব্যবহারে সেই পৃথ্বী সিংকে আমি দেখতে পাইনি।

মনে মনে তেজ সিং-এর পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার প্রশংসা না করে পারে না পৃথ্বী। কিন্তু তার এই ঔদ্ধত্য সহ্য করাও কঠিন। সে কি তবে এখন থেকে ভাবতে শুরু করেছে, দুর্গাদাসের পরে সে-ই হবে

রাঠোরদের নেতা ? এতটা মুর্খ সে হবে বলে মনে হয় না। রাঠোররা একমাত্র রাজার বংশকে পবিত্র বলে মনে করে। আর সবাই তাঁর সেবক।

সে হাত দিয়ে একটা নুড়ি তুলে সজোরে দূরে নিক্ষেপ করে বলে – তেজ সিং, আমার বিশ্বস্ততা দেশের প্রতি, রাজার প্রতি এবং রাজার একজন যোগ্য অনুচর হিসাবে তোমার পিতার প্রতি। সুতরাং এ-ব্যাপারে তুমি মাথা ঘামালে পরিণাম শুভ নাও হতে পারে।

পৃথ্বীর কণ্ঠস্বরে ছিল অপরিসীম বলিষ্ঠতা, তার চোখে ছিল অদ্ভুত জ্যোতি। ফলে তেজ সিং আর কিছু বলতে পারে না। পৃথ্বীর ইচ্ছে হয়েছিল দুর্গাদাসকে বলার আগেই তেজ সিংকে সব কথা খুলে বলে দেবে। কিন্তু সেই ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হয়। তেজ সিং-এর ব্যবহার তাকে ক্ষুব্ধ করেছে। দুর্গাদাসের পুত্র না হলে ক্রোধ রিপুটাকে এতক্ষণ বাগে রাখাই কষ্টসাধ্য হত।

সেনানায়করা সবাই বিদায় নিলে দুর্গাদাস পৃথ্বীকে কাছে ডাকেন। তেজ সিংও সেই সময় ঘরে এসে দাঁড়ায়।

– এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে ? কিছুদিন থাকার কথা ছিল তোমার।

– আর প্রয়োজন হলো না থাকার।

– এত তাড়াতাড়ি প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল কেন ? বীরেন্দ্র সিং-এর বিপদ কেটে গিয়েছে ?

– হ্যাঁ। বীরেন্দ্র সিং-এর যাতে কোন ক্ষতি না হয় একজন মুঘল সেনাপতি সেদিকে লক্ষ্য রাখবে বলে কথা দিয়েছে।

– মুঘল সেনাপতি ? তার সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ হল ?

– সে আমার পূর্বপরিচিত।

– একজন মুঘল সেনাপতি তোমার পূর্বপরিচিত ? কি বলছ তুমি ? শুধু পরিচিত নয়, রীতিমত বিশ্বস্ত বলে মনে হচ্ছে। রহস্য বটে !

– আপনি করিমবক্সের কথা নিশ্চয় ভুলে যাননি। যাকে আশ্রয়

দিয়েছিলাম কয়েকমাস আগে। তার দেখা পেয়ে গেলাম সেখানে। শত্রু হিসাবেই পেয়েছিলাম তাকে। কারণ ছদ্মবেশ সত্বেও আমাকে আর তেজ সিংকে সে চিনে ফেলেছিল সোজাতের বাজারে। তখনি জানতাম কিছু ঘটবে। ঘটলও। আমাকে দেখে সে অনুমান করে নিয়েছিল আপনিও আছেন সোজাতে কোন গূঢ় উদ্দেশ্যে। করিমবক্সকে আমি দেখেছিলাম, এ কথা তেজ সিংকে বলিনি। তবে সারারাত জেগে পাহারা দিয়েছিলাম। আক্রমণ করল ওরা ভোর রাতে। তখনও জানতাম না করিমবক্স এই আক্রমণের নায়ক। তার আগেই আমি তেজ সিংকে গুপ্তপথে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর সেই গুপ্ত-পথ আগলে দাঁড়ালাম। ভেবেছিলাম, মুঘলরা এসেই যদি গুপ্তপথের সন্ধান পায় তাহলে তেজ সিং-এর বিপদ ঘটবে—সেই সঙ্গে আপনারও। তাই স্থির করলাম ওদের সঙ্গে কথা বলে যুদ্ধ করে যতক্ষণ আটকে রাখা যায়। তাতে তেজ সিং অনেকটা পথ চলে যেতে পারবে। তখনো ভাবিনি করিমবক্স স্বয়ং এসে প্রবেশ করবে সেই কক্ষে। সে এলো। সঙ্গে আরও চারজন। সে প্রথমেই তেজ সিং কোথায় জানতে চায়। মিথ্যে বললাম আমি—রাতের প্রথম প্রহরে তেজ সিং চলে গিয়েছে। বিশ্বাস করল না সে। ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। ইচ্ছে করলে সে সদলে আক্রমণ করে আমাকে হত্যা করতে পারত। কিন্তু তার আত্মসম্মানবোধ তীব্র। একবার সে আমার কাছে পরাজিত হয়েছে। তাই সবাইকে অন্য কক্ষে পাঠিয়ে একা লড়তে সুরু করল যোগ্য প্রতিশোধ নেবার আশায়। আমি ক্লান্ত ছিলাম, আর করিমবক্স অত্যন্ত দক্ষ অসি-যোদ্ধা। আমি আহত হলাম, তেজ সিং-এর ডাকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ায়। সেদিন শেষ পর্যন্ত আমি জিতলেও অন্য মুঘলরা ছেড়ে দিত না নিশ্চয়। আহত হলেও দূরে সরে গিয়ে করিমবক্সকে বললাম আপনার সদলে উপস্থিতির কথা। সে কেমন বোবা হয়ে গেল। ভাবলাম, ভাগ্যদেবী এবারও তার প্রতি বিরূপ হলেন। মায়া হল। ওকে লুকিয়ে

রাখলাম গুপ্তকক্ষে। তেজ সিং দেখেছে সেই কক্ষ।

তেজ সিং রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলে—হ্যাঁ, সেই জন্যেই একজনের হিসাব কিছুতেই মিলছিল না। তখনি আমার ধারণা হয়েছিল পৃথ্বী সিং বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

বজ্রকঠিন স্বরে দুর্গাদাস বলে ওঠেন—চুপ কর তেজ। তারপর বল পৃথ্বী।

—আপনারা বিদায় নিলেন। আমি একটা অজুহাত দেখিয়ে থেকে গেলাম। কারণ আমি জানতাম করিমবক্স পর পর দুটো দিন খাদ্য বা পানীয় কিছুই পায় নি। আপনাদের সঙ্গে চলে এলে ওর মৃত্যু ছিল অবধারিত। আর ওর কথা তখন প্রকাশ করলে কি হত বলতে পারি না। আমি তাই ঝুঁকি নিই নি। আপনারা চলে এলে ওকে আমি মুক্ত করলাম। বললাম, একটি সর্তে সে মুক্তি পেতে পারে। সেটি হল বীরেন্দ্র সিং-এর নিরাপত্তা। ওর ধারণা ছিল আপনারা তখনো ওখানে আছেন। তবু প্রথমে প্রবল আপত্তি তুলেছিল। শেষে সব দিক ভালভাবে খুঁটিয়ে দেখে স্বীকার করে নিল। তাকে আমি তেজ সিং যে-পথে বার হয়েছিল সেই পথ দিয়ে বার করে দিলাম। তেজ সিং হয়ত ঠিকই বলেছে—আমি বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু আমার ধারণা আমি বিশ্বাসঘাতক নই। কারণ দেশকে আমি ভালবাসি। রাজার জন্য আমি প্রাণ দিতে পারি। হয়ত এ-ধরণের দুর্বলতা অনেক সময় মারাত্মক হতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা হবে না। করিমবক্সকে মুক্তি দিয়ে বীরেন্দ্র সিং-এর নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় হয়েছে। এখন আপনি চিন্তা করে যে শাস্তি দেবেন আমি তাই গ্রহণ করব। আমি যা করেছি, তার মধ্যে ব্যক্তিগত কোন হীন উদ্দেশ্য আমার ছিল না। সেদিন সোজাত-এ আপনি একা থাকলে তখনি সব খুলে বলতে পারতাম।

দুর্গাদাস অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—না, বিশ্বাসঘাতক তোমাকে বলতে পারি না। বিশ্বাসঘাতক

অনেক বেশী অর্থবহ। আমার আর তেজ সিং-এর জন্যে তুমি নিজের জীবনকে পণ রেখেছিলে সেদিন। তোমার এই দুর্বলতাকে এক ধরণের বলিষ্ঠতা বলা যেতে পারে। সাধারণ মানুষেরা করুণা দেখাতে ভয় পায়। তারা সব সময় ভাবে, বুঝি ঠকে যাবে। তেজ সিং তোমাকে ভুল বুঝেছে। এরকম ভুল অনেকেই বুঝবে তোমার জীবনে আরও অনেকবার। সেই ভুল নিরসনের সময়ও পাবে না তুমি। এই যন্ত্রণা তোমার জীবনের সাথী হবে। একেবারে সাধারণ মানুষের এমন হয় না—এতে তাদের সুবিধে।

তেজ সিং-এর মুখ লাল হয়ে ওঠে। অন্ধকার হয়ে আসায় সেই মুখ কারও দৃষ্টিগোচর হয় না।

দুর্গাদাস উঠে গেলে তেজ সিং পৃথ্বীর কাছে এসে বলে—আমায় ক্ষমা কর।

—সে কি তেজ সিং। ওভাবে বলো না।

—আমাব ভুল সাধারণ মানুষের ভুল।

—মোটেই না। আসলে তুমি আর আমি দুজনেই এখনো যথেষ্ট অনভিজ্ঞ।

—ভবিষ্যতে তোমাকে নেতা হিসাবে দেখব।

—আমাদের সবার নেতা রাজা অজিত সিং, আমাদের নেতা দুর্গাদাস। অন্য কোন নেতা নেই আমাদের। আর আমরা দুজন দুজনার সঙ্গী।

—ভাল মাংস আছে। খাবে?

—সত্যি? ভীষণ ক্ষিধে পেয়েছে। তিনদিন ভাল করে খাইনি।

পাহাড়, পাহাড়তলী, দূরদূরান্তের গ্রামের সবাই দুর্গাদাসের সঙ্গে আজমীঢ় যেতে রাজী—শুধু একটি সর্তে। আগে কত যুদ্ধে তারা যোগ দিয়েছে। কত অবজ্ঞায় নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু যুদ্ধযাত্রার আগে এভাবে কোনদিন সর্ত আরোপ করেনি। তারা

জানে দুর্গাদাস অন্যায় করতে পারেন না। দুর্গাদাস তাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয়। সারাজীবন দুর্গাদাসের ত্যাগ স্বীকার তাদের কাছে আদর্শ। জীবিত অবস্থাতেই তিনি মাড়োয়ারের প্রবাদ পুরুষ। সেই দুর্গাদাসকে ওরা বলল, যুদ্ধে যেতে তারা প্রস্তুত, কিন্তু—

অন্তত কয়েক হাজার অধিবাসী, যাদের অধিকাংশই পাহাড়ী, চিরকাল যারা দারিদ্র্য পীড়িত, দুবেলা আহার্য যাদের কোনদিনই জোটে না, অথচ দেশাত্মবোধ যাদের অপরিসীম, রাজার প্রতি আনুগত্য যাদের প্রশ্নাতীত—সেই কয়েক হাজার অধিবাসী দুর্গাদাসকে ঘিরে দাঁড়াল। সারা মাড়োয়ারের পক্ষ থেকে শুধু একটি মাত্র বিনীত প্রার্থনা জানাতে চাইল তারা।

—বল। বল তোমাদের কী বলার আছে। তোমরা যা বলবে সে কথা শুনতে আমরা বাধ্য।

কিছুক্ষণ সবাই নীরব। গাছের পাতা নিথর। পাহাড়ের পাথর থেকে বাষ্প উঠছে প্রচণ্ড রৌদ্রে।

একজন বয়স্ক ব্যক্তি এগিয়ে এসে বলে—আমরা পানীয় জল খাই, কিন্তু তাতে কোন মিষ্টতা নেই। আমরা রুটি খাই, তাও স্বাদহীন।

—কেন? কেন?

—আমরা যে আমাদের নয়নের মণি রাজাকে এখনো দেখতে পেলাম না। চিরকাল শুনে আসছি তিনি আছেন, তিনি আছেন। তিনি অবশ্যই আছেন। আপনি যাঁকে মুঘলদের গ্রাস থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছেন, যাঁকে আপনার নিজের বড় ভাই-এর তত্ত্বাবধানে রেখেছেন—তিনি সুস্থ আছেন আমরা জানি। কিন্তু আর কতদিন? কতদিন আমরা না দেখে থাকব তাঁকে? আমাদের উদ্যম ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে—আমাদের আশা নির্বাপিত হয়ে আসছে।

দুর্গাদাসের বুকের ভেতরটা ব্যথায় টনটন করে ওঠে। তাঁর মুখ থমথমে। দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে মুহূর্তের জন্য কী যেন ভাবলেন তিনি।

শেষে গুরুগম্ভীর স্বরে বলেন—তোমাদের আদেশ অগ্রাহ্য করার মত ক্ষমতা আমার নেই। আমি কে? তোমরাই সব। রাজাকে দেখবে তোমরা। এর মধ্যে যদিও যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে; আমি বিশ্বাস করি আমাদের মধ্যে এমন একজন নেই যে তাঁর কথা মুঘলদের কাছে গিয়ে বলে দেবে।

হাজার কণ্ঠ বল্লম, লাঠি, তলোয়ার, তীর-ধনুক উঁচিয়ে বলে ওঠে —না। কেউ নেই। তেমন কেউ জন্মাতে পারে না রাঠোরদের মধ্যে।

—এতেই তোমরা সন্তুষ্ট? শুধু একবারের দর্শনেই সন্তুষ্ট তো?

—হ্যাঁ। শুধু একবার।

—বেশ। তোমরা তাহলে এখানে অপেক্ষা কর। আজ রাতের মধ্যে রাজাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি।

আনন্দের স্রোত বয়ে যায় জনতার মধ্যে। সেই আনন্দে তাদের অন্তর যতটা আলোড়িত তার বহিঃপ্রকাশ আর কতটুকু? রাঠোররা আদৌ ভাবপ্রবণ জাতি নয়—স্বাধীনতা আর আহার্যের জন্য অবিরাম প্রচণ্ড সংগ্রাম তাদের বাস্তবমুখী করে রেখেছে চিরকাল।

সেই রাত্রে রাজা অজিত সিং এলেন। সবাই অভিভূত—স্তব্ধ। পৃথ্বীর চোখে সামান্য বাষ্প—কিছুতেই রোধ করতে পারল না। অনেকে কাঁদল। তাদের মহারাজা—কত আপন জন। কোথায় যোধপুরের সিংহাসন আলোকিত করবেন, তা নয় পাহাড়ের অরণ্যের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছেন বছরের পর বছর। সেই সঙ্গে রয়েছেন রাজমাতা—যিনি মেবার বংশের কন্যা। তাঁর অনুরোধে মহারাণা রাজসিংহ রাঠোরদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বলে আজও অজিত সিং জীবিত। কিন্তু তিনি রাজার সুখ নিয়ে জীবন কাটাতে পারছেন না। তবে দুর্গাদাসের নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁকে সব রকম শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলছেন। আর তাঁর জীবন রক্ষা করছে একদল পাহাড়ী মানুষ দিনরাত অতন্দ্র প্রহরা দিয়ে।

সবাই চেয়ে চেয়ে দেখে তাদের রাজাকে। দেখে আর আশা মেটে না। মশালের এই অল্প আলোয় যেন পরিপূর্ণ রূপটুকু ফুটে উঠতে পারছে না। দিনের আলোয় কত ভালভাবে দেখা যেত। কিন্তু সে পথ বন্ধ। বিপদ কখন কোথা থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক কি? তার চেয়ে এই ভাল।

একজন বৃদ্ধ বলে ওঠে—ঠিক মহারাজা যশোবন্ত সিং-এর মত। সেই মুখ, সেই চোখ।

বৃদ্ধ চোখের জল ফেলে। মহারাজার সঙ্গে সে অনেক যুদ্ধ করেছে। দারাশিকোর পক্ষে আওরঙজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। শাহজাহানের হয়ে যুদ্ধ করেছে। আবার শেষে আওরঙজেবের পক্ষেও একবার যুদ্ধ করেছে।

পৃথ্বীও চেয়ে চেয়ে দেখে। তেজ সিং-এর চেয়ে সামান্য ছোট বলে মনে হয়। আবার সমবয়সীও হতে পারে। কিন্তু বেশ শক্ত সমর্থ। মুখে চোখে রয়েছে ব্যক্তিত্বের ছাপ। কবে তারা তাদের রাজাকে যোধপুরের সিংহাসনে দেখতে পাবে কে জানে।

সে রাতে রাজা বিদায় নেবার পর দুর্গাদাস সবার মধ্যে গরম রুটি বিতরণ করেন। প্রত্যেককে দেওয়া হয় পানীয় জল।

দুর্গাদাস হেসে বলেন—কেমন লাগল রুটি! জল কেমন লাগল?

সবাই বলে—অপূর্ব। এত ভাল রুটি কতদিন খাইনি। এমন মিষ্টি জল মাড়োয়ারে আছে বলে জানতাম না।

—মিষ্টি বলছ কি? এ জল তো নোনতা। মাড়োয়ারের সব জল এর চেয়ে ভাল।

—তাই নাকি? কিন্তু আমাদের তো মিষ্টি লাগছে দেখছি! খুব মিষ্টি।

কাউকে না ডেকে পৃথ্বীকে একা ডেকে পাঠালেন দুর্গাদাস পরদিন

ভোরবেলায়। তেজ সিং তখনো নিদ্রিত। তবে আর সবাই জেগে উঠেছে। দলে দলে পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে শিকারের সন্ধানে।

দুর্গাদাস তাকে বলেন—মনে আছে বোধহয় তোমার, একদিন গুপ্তচর বৃত্তিতে তোমার ঘৃণা দেখে বলেছিলাম, প্রয়োজনে দেশের জন্যে সবকিছু করা যায়।

— হ্যাঁ, মনে আছে।

— এবারে তোমাকে সেই ধরণের একটা কাজ দেব।

— আমি যুদ্ধ করতে ভালবাসি।

— আমিও বাসি। তবু আমি নিজে কত সময় গুপ্তচরের কাজ করেছি। যুদ্ধ করতে হলে বুদ্ধির পরিচয়ও দিতে হয়। আবার সাধারণ সৈনিক হলে অস্ত্রবিদ্যা আর বলিষ্ঠতার প্রয়োজন বেশী। শুধু যুদ্ধ কবার জন্যে অনেক লোক পাওয়া যায়। তোমাকে যে কাজ দেব তাতে যুদ্ধের অবকাশ যেমন আছে, বুদ্ধির যুদ্ধও রয়েছে তেমনি। সেই সঙ্গে রয়েছে বিশ্বস্ততা ও কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা। তোমাকে আমি উপযুক্ত ভেবেছি। তুমি রাজী না হলে অন্য কাউকে খুঁজে বার করতে হবে। তাতে সময়ের অপচয়।

— আমাকে আদেশ করুন।

— তুমি রাজী?

— হ্যাঁ।

— বাদশাহ আজমীঢ়ে শিবির স্থাপন করে অপেক্ষা করছেন। তাঁর অনেক সৈন্য এদিক ওদিকে ছিটিয়ে রয়েছে। তিনি নিশ্চিন্ত আছেন, তুই পুত্র এবারে মেবার আর মাড়োয়ারকে পর্যুদস্ত করবে। তুমি জান আমাদের কার্যক্রম। আকবর আজমীঢ়ের কাছে উপস্থিত হয়ে নিজেকে হিন্দুস্থানের বাদশাহ বলে ঘোষণা করবে। তার পরেই আওরঙজেবকে আমরা সবাই মিলে আক্রমণ করব। বাদশাহের সৈন্যসংখ্যা এত কম যে তিনি পরাজিত হবেন। আর তিনি পরাজিত

হলে মেবার আর মাড়োয়ার পূর্ণ শক্তি নিয়ে জেগে উঠবে। কারণ আকবর আমাদেরই হাতে তৈরী।

তুর্গাদাস একটু থেমে পৃথ্বীর মুখের দিকে চেয়ে বলেন—বুঝতে পারছ নিশ্চয় ?

—হ্যাঁ।

—তুমি সম্ভবত শুনেছ, আকবর অত্যন্ত বিলাসী। সে অতিরিক্ত সুরাপানে অভ্যস্ত, তার শিবিরে নারীর প্রাচুর্য। তাকে সঙ্গে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কোন কাজে সাফল্য লাভ করা তুরূহ ব্যাপার। বাদশাহ নিজেও পারেন নি। তাই আমি তোমাকে আগে থাকতে আজমীঢ়ে পাঠাতে চাই।

—আজমীঢ়ে ?

—সেখানে তোমার অসুবিধা হবে না। অনেক রাজপুতের বাস ওখানে। তাদের মধ্যে মিশে যাবে। তবু তোমাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। কারণ আজমীঢ় সোজাত নয়। আওরঙজেব সোজাতে থাকলে তুমি আর তেজ সিং প্রথম দিনেই ধরা পড়ে যেতে। তাঁর নজর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। গিয়ে দেখবে তাঁর শৃঙ্খলা কত উঁচুদরের। সেখানে সুরা নেই, নারী নেই। আলস্য তো নেই-ই।

—কী করতে হবে আমাকে ?

—বেশী কিছু নয়। শুধু জানতে চেষ্টা করবে বাদশাহের সৈন্য সংখ্যা ঠিক কত। সৈন্যরা কখন কি করে ? তুমি বাদশাহের যুদ্ধ পরিকল্পনা শত চেষ্টা সত্বেও জানতে পারবে না। কারণ তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি এ-ব্যাপারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জানতে পারে না। তাছাড়া এবারের যুদ্ধ আমাদের। তুমি দেখবে, আকবরের পরিকল্পনার কথা তিনি জানতে পেরেছেন কিনা।

—আমি চেষ্টা করব। কবে নাগাদ রওনা হব ?

—তু'দিনের মধ্যে। আজ রওনা হলে সব চাইতে ভাল হয়। সময় নষ্ট করে লাভ নেই। কেন, তুমি বাড়িতে গিয়ে দেখা করে

আসতে চাও ?

— না, আমি আজই যাব।

— খুব সাবধান। তেজ সিং-এর কাছ থেকে একটা ভাল পোষাক নিয়ে যেও। তোমার পোষাক ছিঁড়ে গিয়েছে।

— কতদিন থাকব ? সব জানতে পারলে ফিরে আসব তো ?

— হ্যাঁ। ওখানে বসে থেকে লাভ নেই। তাছাড়া তুমি প্রথম ব্যক্তি নও। আরও দুজন রয়েছে ওখানে। সম্ভবত তাদের একজন ধরা পড়েছে। ধরা পড়লে, অসহ্য নির্যাতন আর মৃত্যু অনিবার্য। তোমার পরে আর একজনকে পাঠাবো। তোমাদের মধ্যে যে কোন একজন সফল হলে মাড়োয়ারের লাভ।

— অন্যদের কি আমি চিনি ?

— ঠিক জানিনা। মুখ চিনতে পার। চিনলেও না চেনার ভান করবে।

মায়ের কথা রুক্মিণীর কথা মনে হয় পৃথ্বীর। তারা জানে, সে যুদ্ধ করতে এসেছে। জানে না শত্রু পুরীতে বসে থেকেও অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না। শান্তশিষ্ট ভাবে তাদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলতে হবে। কত মিথ্যা বলতে হবে। রুক্মিণী জানলে তো ক্ষেপে উঠবে। বলবে, যুদ্ধে গিয়ে মিথ্যা কথা বলা কেন ?

পৃথ্বী আপন মনে হাসে। রুকিণী বড় ছেলেমানুষ। এদিকে সে পৃথ্বীকে বলে ছেলেমানুষ। এবারে ফিরে আসতে পারলে রুক্মিণীকে বুঝিয়ে দেবে কে ছেলেমানুষ। দুর্গাদাস তার উপর নির্ভর করে কত বড় দায়িত্ব দিয়েছেন, একথা জেনে তার মুখ চোখের যা চেহারা হবে ভাবতেই পৃথ্বীর হাসি পেয়ে যায় আবার।

আজমীঢ় আর সোজাতে অনেক পার্থক্য। আজমীঢ় বর্ধিষ্ণু নগর। এখানে মুঘলদের স্থায়ী এবং পাকাপোক্ত ঘাঁটি রয়েছে। শিবির ছাড়াও সৈন্যনিবাস রয়েছে অনেক। বাদশাহ কিন্তু নিজে থাকেন

শিবিরে। সেই শিবিরের কাছে পৌঁছানো এক দুরূহ ব্যাপার। কারণ তার চারপাশ এমনভাবে সুরক্ষিত যে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি এবং খুব উঁচুদরের সেনানায়ক ছাড়া সেখানে যাওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

পৃথ্বী গ্রামের ছেলে। আজমীঢ়ে পৌঁছে প্রথমটা একটু বিমূঢ় হয়ে পড়ে। সবচেয়ে আগে চাই তার একটি আশ্রয়স্থল। কোথায় জুটবে? সঙ্গে অর্থ রয়েছে। কারও বাড়িতে উঠলে স্বাধীনতা থাকে না। কে কেমন লোক কেউ বলতে পারে না। তাই সরাই-খানায় ওঠা স্থির করে। কারণ সেখানে নিত্য নতুন মানুষের আনাগোনা। কেউ কারো খোঁজ রাখে না। শুধু তাকে দেখতে হবে সরাইখানার মালিক এবং আশপাশের লোকেরা যেন তাকে সন্দেহ না করে।

নন্দিনীকে রাখা যেতে পারে এমন একটি সরাইখানা শেষপর্যন্ত খুঁজে পেল সে। তবে মালিক বলল, ঘোড়ার দায়িত্ব তার নিজের। কারণ ঘোড়া চুরি এখানে প্রত্যহের ব্যাপার। তাছাড়া ঘোড়ার দানা পানি জোটানো সম্ভব নয়। মনটা খারাপ হয়ে যায় পৃথ্বীর। শেষে ঠিক করল সরাইখানার ভেতরে না শুয়ে বাইরে যে ছোট্ট ঘরটিতে নন্দিনী থাকবে, সে-ও সেখানে থাকবে। মালিককে কথাটা বলতে বিস্মিত হলেও পরে রাজী হয়ে যায়। লোকটি মধ্যবয়সী ভালমানুষ। দিল্লীর কাছাকাছি কোথায় যেন বাড়ি। পৃথ্বী এখানে কাজের সন্ধানে এসেছে জেনে সে সহানুভূতি জানায়। কারণ সে নিজেও একদিন ভাসতে ভাসতে এসে এখানে ঠেকেছে।

পৃথ্বীর মুশকিল হয়েছে তার পরিচয় নিয়ে। কেউ যদি জানতে চায় তার দেশ কোথায় তাহলে মিথ্যা কথা বলায় বিপদ আছে। কারণ এখানকার অধিকাংশ মানুষ সারা হিন্দুস্থান চষে ফেলেছে। অথচ তার দৌড় যোধপুর আর সোজাত অবধি। সে যদি সত্যি কথা বলে তাহলে কেউ তাকে সন্দেহ করবে কিনা বুঝতে পারে না। তবু

মনে মনে ঠিক করে সত্যি কথাই বলবে সে। তার পক্ষে সেটা হবে নিরাপদ। একটু বোকা সেজে থাকলে কে আর সন্দেহ করবে ?

দ্বিতীয় দিন থেকে সে ঘুরতে শুরু করে। মুঘল শিবিরের আশপাশ দিয়ে ঘোরে উদ্দেশ্যহীনভাবে। কয়েকটা দিন কেটে যায়। সব কিছু সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা এসে যায়। একদিন দেখতে পায় একটা ঘেরা জায়গায় অনেকগুলো ঘোড়া। সংখ্যায় কম করে হবে দুশো। কী সুন্দর দেখতে ওদের। কয়েকটা বড়ই অদ্ভুত। খুব উঁচু জাতের ! মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে পৃথ্বী। সে দেখতে পায় কয়েকজন লোক ঘোড়াগুলোকে পরিচর্যা করছে।

এতই তন্ময় হয়ে দেখছিল সে, যে কখন একজন অশ্বারোহী তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, খেয়াল করেনি সে।

– কী দেখা হচ্ছে ?

চমকে পেছন ফিরে দেখে একজন মুঘল চমৎকার সাজে তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে। প্রথম দর্শনেই বোঝা যায় অতি উচ্চপদস্থ ব্যক্তি সে।

বোকার মত পৃথ্বী বলে – কী সুন্দর !

– এখানে এসেছ কেন ?

– ঘুরতে ঘুরতে এসেছি। একসঙ্গে এত ঘোড়া কখনো দেখিনি।

– তোমারটিও তো মন্দ নয়।

– হ্যাঁ। এ খুব ভাল। কিন্তু ওরা ক-ত ভাল। কত বড়।

– ও সব আরবী ঘোড়া। দেখোনি ?

– না।

– কোথা থেকে এসেছ তুমি ?

– মাড়োয়ার।

– মাড়োয়ার ?

—হ্যাঁ। ওখানে কাজ নেই। না খেয়ে থাকতে হয়। তাই পালিয়ে এসেছি। আমি ঘোড়ার দেখাশোনা করতে পারি। ওদের

মত যদি একটা কাজ পেতাম।

লোকটা একটু ভেবে নিয়ে বলে — এসো আমার সঙ্গে।

এতক্ষণে পৃথ্বী হাঁফ ছাড়ে। লোকটি মনে হচ্ছে তাকে একটা কাজ দিলেও দিতে পারে। মন্দ হবে না। নন্দিনীর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ওদের সঙ্গে মোগলাই দানা-পানি পাবে। কিছু অর্থও উপার্জন হবে।

লোকটি বলে — তোমাকে কাজ দিতে পারি।

— দেবেন? সত্যি দেবেন? আপনার দয়ার তুলনা নেই।

— দয়া-টয়া কিছু নয়। কাজ ঠিকমত করতে না পারলে তোমার ঘোড়াটিও হারাবে।

— আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এখুনি লেগে যাব কাজে?

— না।

লোকটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে। অস্বস্তি হয় পৃথ্বীর।

— তুমি দেশে কি করতে?

— চাষ।

— এখন করনা কেন?

— একা কি করে করব? সব তো পালিয়েছে পাহাড়ে।

— হুঁ। তুমি যুদ্ধ করতে পার?

— যুদ্ধ? চেষ্টা করলে পারব। বল্লম দিয়ে শিকার করেছি।

— সে সব সবাই করে।

— হ্যাঁ। আমাদের গাঁয়ের সবাই শিকার করতে জানে।

— তুমি তলোয়ার ধরতে জান?

— না।

— দেখি তোমার হাত?

পৃথ্বীর ভেতরটা কেঁপে ওঠে। সে হাত বাড়িয়ে দেয়।

লোকটি রাগে চেঁচিয়ে বলে — এতক্ষণ মিথ্যা কথা বলছিলে।

— না হুজুর। আপনি এই দাগের কথা বলছেন? ওটা দড়ির দাগ। বলদের গাড়ি ছিল আমার।

— কি করে বুঝলে দাগের কথা বলছি?

— আমাকে আরও কত লোক বলেছে। তাদের বলি দারুণ তলোয়ার খেলি।

— মিথ্যে বলার চেষ্টা কোরো না। তোমাকে দেখতে বোকা হলেও আসলে তুমি সেয়ানা।

— আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার মাও তাই বলে।

— ঘোড়ায় চড়তে খুব ভালই জান?

— হ্যাঁ। ঘোড়ায় চড়তে পারি। ছোটবেলায় শিখেছি।

পৃথ্বী যখন কথা বলছিল তখন অন্যসবাই কাজ ফেলে রেখে তার দিকে চেয়ে রইল। ওদের মধ্যে দু-চারজন মুঘল ছাড়া বাকী সবাইকে স্থানীয় লোক বলে মনে হল তার।

লোকটির ধমকে ওরা কাজে মনে দেয়। কিন্তু কয়েকজন বাঁকা দৃষ্টিতে তাকে দেখতে থাকে। পৃথ্বীর আনন্দ হয় ওদের হাবভাব দেখে।

মুঘলটি শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে ওকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে চলে যায়। মনের সুখে কাজ আরম্ভ করে দেয় পৃথ্বী। কিছুক্ষণ কাজের পর নন্দিনীকে টেনে একটা পাত্রের সামনে বেঁধে দেয়। এতক্ষণ সবার খাদ্যের দিকে চেয়ে বোধ হয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছিল সে। সে এই খাদ্য জীবনে দেখেনি। শুধু নন্দিনী কেন, তাদের গ্রামের অনেকেই এত বড় বড় ছোলার দানা কতদিন পায় নি খাদ্য হিসাবে।

একজন মানুষ পৃথ্বীর আশেপাশে ঘোরাফেরা করছিল। প্রথমে অতটা খেয়াল করেনি। কিন্তু কেউ যদি একাগ্রভাবে একজনের ওপর নজর রাখে তাহলে একটা অজ্ঞাত অস্বস্তিতে মন ভরে ওঠে। পৃথ্বীরও তাই হল। তার মনে হতে লাগল কেউ যেন ক্রমাগত তার দিকে চেয়ে রয়েছে। কখনো তার ঘাড়ের কাছে চুলকে উঠছে—কখনো

মনে হচ্ছে কানের পেছনের দিকে একটা সামান্য জায়গায় রোদ এসে লাগছে। বারবার মাথা ঘুরিয়ে তেমন কাউকে দেখতে পায় না। আশেপাশের সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। তবু একসময় সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। ঠিক করল ধাঁ করে মাথা ঘুরিয়ে দেখে নেবে। কিন্তু কোনদিকে ঘোরাবে? বেশ, প্রথমে বাঁয়ে ঘোরাবে। কারণ বাঁ কানের একটা জায়গায় যেন কড়া রোদ এসে লাগছে। এক-দুই-তিন। সে বাঁয়ে মুখ ঘুরিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে অদূরে দণ্ডায়মান মানুষটি অপ্রস্তুত হয়ে তার মুখটিও অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়। পৃথ্বী দেখে ফেলে তাকে। বাঁচা গেল। কিন্তু ওর এত কৌতূহল কেন? বিশ্রাম নেবার ছলে পৃথ্বী উঠে দাঁড়ায়। তারপর লোকটির দিকে অন্যমনস্কভাবে এগিয়ে যায়। লোকটিও সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে সরতে থাকে।

লোকটিকে এখানে কাজ করতে দেখেছে বটে। কিন্তু তার পরিচ্ছদ ঠিক এদের মত নয়। একটু অন্য ধরণের। তবে গায়ে ময়লা রয়েছে যথেষ্ট।

—ও ভাই শুনছ?

লোকটি মুখ ঘোরায় তার দিকে। কোথায় দেখেছে এই মুখ? এ যে পরিচিত। অথচ লোকটি রাজপুত নয়—মুঘল। একে চেনার তো কথা নয়। পোষাক-পরিচ্ছদ সত্যিই এর একটু অন্য ধরণের। কিছুক্ষণ আগে প্রথম কাজে লাগার সময় একে দেখা যায় নি। পরে এসেছে নিশ্চয়। কিংবা অন্যদিকে ছিল হয়ত। মুখখানা পরিচিত—খুব পরিচিত। তবে কি দুর্গাদাস যাদের আগে পাঠিয়েছেন তাদের একজন? হতে পারে। হ্যাঁ, হতে পারে। সেটাই সম্ভব। সুন্দর ছদ্মবেশ নিয়েছে তো। এর সঙ্গে কথা না বলাই ভাল।

পৃথ্বী আপন কাজে মন দেয়। তারপর একসময় কাজ শেষ হয়। সবাই সেই ঘেরা জায়গার বাইরে আসে। নন্দিনীকে নিয়ে পৃথ্বী চলতে থাকে তার সরাইখানায়। সে ঠিক করে, আগামীকাল

কয়েকজনের সঙ্গে ভাব জমাতে হবে। তাতে কিছু কিছু খবর জানা যাবে। সরাইখানায় বসেও টুক্‌রো টুক্‌রো খবর পাওয়া যায়। এই ভাবে কয়েকদিন চললে নিজেই একটা পদ্ধতি ঠিক করে নিতে পারবে।

সরাইখানার মালিক প্রশ্ন করে—আজ একটু ক্লান্ত মনে হচ্ছে?

—হ্যাঁ। একটা কাজ পেয়েছি।

পৃথ্বী বেশ খোশ মেজাজে তার কাজের বর্ণনা দেয়। আশপাশে সবাই উৎসুক হয়ে শোনে। সে বুঝতে পারে তার কাজটি এদের কাছে মোটেও তুচ্ছ নয়। সে অবশ্য এখনো জানে না তার প্রাপ্য কত। শুনেছে তিন চার দিন অন্তর সেই মুঘল এসে অর্থ দেয়। ওদের কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছে অর্থের পরিমাণ একেবারে নগণ্য নয়।

কিন্তু এতসব কথার পরও সেই পরিচিত মুখখানি এখনো ভেসে ভেসে উঠছে তার চোখের সামনে। কোথায় দেখেছে তাকে? এ এক বিড়ম্বনা। মন থেকে তাড়াতে পারছে না। দুর্গাদাসের পাশে দেখেছে? মনে পড়ে না। পাহাড়ে কিংবা গাঁয়ে কোথাও। সে মনের ভেতরে হাতড়ে বেড়ায়।

রাতে নন্দিনীর কাছাকাছি শুয়ে শুয়েও সে ভাবতে থাকে। একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ঘুম আসতে চায় না। মুঘলের পোষাকে রাজপুত? নাকি সত্যিই কোন মুঘল? মুঘলদের সে সম্প্রতি দেখে এসেছে সোজাতে। তাদের কেউ এখানে আসবে না নিশ্চয়। তারা বাদশাহজাদা আকবরের অধীনে কর্মরত। তাদের মধ্যে কেউ কি? বোধহয় না। কারণ লোকটির হাবভাব দেখে তার ধারণা হয়েছে সে পৃথ্বীকে চেনে। কোন মুঘলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা নেই—একমাত্র করিমবক্স ছাড়া।

ভাবতে ভাবতে রাত গভীর হয়। হঠাৎ সে শয্যা ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে। পাশের এক কোণ থেকে লুকোনো তলোয়ার তাড়াতাড়ি বার করে নেয়। নন্দিনীর বাঁধন এক টানে খুলে ফেলে। বড্ড দেরি

হয়ে গিয়েছে। তবু চেষ্টা করতে হবে, যাতে আজমীঢ় ছেড়ে যেতে পারে। ওই লোকটি সেই পাগল। সোজাতের বাজারে যে পাগলামী করত। করিমবক্স বীরেন্দ্র সিং-এর প্রাসাদ আক্রমণের আগের সন্ধ্যায় ওই লোকটিকে সে প্রাসাদের সামনে দিয়ে বিড় বিড় করে আপন মনে বকতে বকতে যেতে দেখেছিল। পোষাকের পরিবর্তন হলেও, মুখের কোন পরিবর্তন হয় নি।

নন্দিনীর লাগাম ধরে বাইরে এসেই সে দাঁড়িয়ে পড়ে। পনেরো কুড়িজন সশস্ত্র মুঘল সেনা দাঁড়িয়ে রয়েছে তারই অপেক্ষায়। মুহূর্তে বুঝে ফেলে পৃথ্বী এদের সঙ্গে যুদ্ধ করা বৃথা। সে একেবারে অপ্রস্তুত। কোষ থেকে তলোয়ার বার করারও সময় নেই। ক্ষোভে দুঃখে সে জ্বলতে থাকে। দুর্গাদাস যোগ্য লোককে নির্বাচিত করেন নি।

সেই পাগল এগিয়ে আসে। এখন তার বেশ দেখে মনে হয় যথেষ্ট পদমর্যাদা রয়েছে! করিমবক্সের প্রায় সমতুল্য মনে হয়।

লোকটি বলে—বড় দেরিতে মনে পড়ল আমাকে। তাই না?

পৃথ্বী নীরব।

—দুঃখ করে লাভ নেই। আগে মনে পড়লেও পালাতে পারতে না। তবে এমন অসহায় অবস্থায় ধরা পড়তে হতো না। কিছুটা খেল্ দেখাতে পারতে।

—বাচালতা ছাড়ো। কি করতে চাও আমাকে নিয়ে?

—অধৈর্য হয়ো না। সব জানতে পারবে। কিন্তু সেদিন তোমরা কীভাবে মুঘলদের পরাস্ত করলে সেটা এখনো রহস্য। আগে সেকথা শুনিয়ে দাও।

—না।

—সবই শোনাতে হবে। বাদশাহের কাছে আগে নিয়ে যেতে দাও। তার আগে তোমাকে এতটুকু কষ্ট দেওয়া হবে না। কিন্তু তারপর? ভাবতে পারো?

—অত ভাববার প্রয়োজন দেখি না।

—তা বটে। দুর্গাদাসের একান্ত সহচর তুমি। শুনেছিলাম দুর্গাদাস সোজাতে এসেছিল। বাদশাহের জরুরী ডাকে আমাকে চলে আসতে হয়েছিল। তাই দেখে আসতে পারিনি। করিমবক্স নামে একজনকে তোমাদের আস্তানা দেখিয়ে দিয়ে পরের রাতেই আজমীঢ়ের দিকে রওনা দিয়েছিলাম।

লোকটির ইশারায় একজন পৃথ্বীর হাত থেকে নন্দিনীর লাগাম কেড়ে নেয়। ভীষণ কষ্ট হয় পৃথ্বীর। নন্দিনীকে জীবনে আর দেখতে পাবে না। একজন তার পিতার তলোয়ার খুলে নেয়। সে চমকে উঠে বাধা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তিন চার জন চেপে ধরে তাকে। নিজেকে এত অসহায় সে জীবনে অনুভব করেনি। বুক ফেটে যায়। কোন রাজপুত কি তার মত শোণিতশূন্য শুষ্ক তলোয়ার সমেত বন্দীত্ব স্বীকার করেছে কখনো? মা আর রুক্মিণী একথা কোনদিন শুনতে পেলে কীভাবে সান্ত্বনা পাবে। সারা জীবন তাদের এই লজ্জা বুকে নিয়ে কাটাতে হবে।

নন্দিনী একবার ডেকে ওঠে। ঘটনার অস্বাভাবিকতা সে বুঝতে পারে। সে দেখতে পায় তার অতি আপনজনকে একদল লোক পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে। আর সে চলেছে পেছনে পেছনে সওয়ার শূন্য অবস্থায়। তার লাগাম ধরা রয়েছে অপর একজন অশ্বারোহীর হাতে।

আকাশে চাঁদ রয়েছে। তাই রাজপথ একেবারে অন্ধকার নয়। কিন্তু জনশূন্য। পৃথ্বী মনে মনে পালাবার অনেক ফন্দি বার করার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুই সম্ভব নয়। সে নিরস্ত্র। তার কোমরে লুকোনো ছুরিটা ওরা এখনো দেখতে পায়নি। পরে নিশ্চয় দেখবে।

কিছুক্ষণ পরে ওরা একটি সৈন্য পরিবেষ্টিত ঘেরা জায়গায় প্রবেশ করে। সেখানে কতকগুলো ছোট ছোট শিবির চোখে পড়ে। সব শিবিরেই কড়া পাহারার ব্যবস্থা রয়েছে।

লোকটি তাকে নিয়ে একটি শিবিরে প্রবেশ করে। সে বলে—

বাকী রাতটুকু শান্তিতে কাটিয়ে দাও। কাল থেকে অশান্তি সুরু হবে। হাজার হলেও তুমি আমার পরিচিত ব্যক্তি। তাই আগাম জানিয়ে রাখলাম। সকালে প্রস্তুত থেকো। বাদশাহের সামনে তোমাকে হাজির করা হবে।

লোকটি বিদায় নিলে ভূমিতে শুয়ে পড়ে পৃথ্বী। বাইরে একাধিক প্রহরীর অস্তিত্ব অত্যন্ত প্রকট। তবু এর মধ্যেই সুযোগ খুঁজতে হবে। আজ না হোক কাল। বেঁচে থাকলে তার পরেও।

একটু পরে সে আচমকা চিৎকার করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে একজন প্রহরী হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে প্রবেশ করে পৃথ্বীকে প্রচণ্ড ধমক দেয়। কড়া গলায় বলে—চেঁচাচ্ছ যেন শূয়োরের মত।

—জল পিপাসা পেলে চেঁচাব না?

—ওসব মিলবে না আজ।

—কালকে মিলবে?

—যদি বেঁচে থাক মিলতে পারে। বাচ্চা ছেলে যতটুকু পায় ততটুকু।

—তোমার দেশ কোথায়?

—ওসব মতলব ছাড়ো। তোমাদের পাহারা দিয়ে বুড়ো হতে চললাম। ভাব জমিয়ে পালাতে পারবে না। বন্দুক আছে। দূর থেকে খতম করে দেব। কত হয়েছে অমন।

—আমি জল খাবো।

লোকটা এগিয়ে এসে ঠাস্ করে থাপ্পড় মারে পৃথ্বীর গালে। বলে—একটু বেচাল দেখলেই মেরে ফেলব।

—মেরে ফেলবে? তাহলে তুমিও মরবে। আমাকে ধরে আনা হয়েছে বিশেষ কারণে।

সে ধীরে ধীরে প্রহরীর কাছে গিয়ে আচমকা তাকে চড় মারে। বলে—মেরে ফেলো দেখি কতখানি হিম্মত।

লোকটির চোখ বাঘের মত জ্বলতে থাকে। সে ঝাঁপিয়ে পড়তে

পারত পৃথ্বীর ওপর। কিংবা তাকে আহত করতে পারত। কিন্তু পৃথ্বীর কথা তাকে সংযত রাখে। সে পৃথ্বীকে পদাঘাত করতে যায়। আগে থেকে বুঝে ফেলে পৃথ্বী সরে দাঁড়ায়। লোকটি নিজেকে সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। পৃথ্বী তার পিঠের ওপর চেপে বসতেই সে চেঁচিয়ে ওঠে।

বাইরে দরজায় পদশব্দ শোনা যায়। পৃথ্বী তাড়াতাড়ি উঠে এক পাশে ভালমানুষের মত বসে পড়ে।

একসঙ্গে তিনজন ভেতরে ঢুকে প্রশ্ন করে—কি হয়েছে ?

আগের প্রহরী লজ্জায় অপমানে কিছু বলতে পারে না।

—কি হয়েছে ? চেঁচাচ্ছিলি কেন রহমৎ ?

পৃথ্বীকে দেখিয়ে সে বলে—এই শূয়োরটা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল।

পৃথ্বী বলে—মিথ্যা কথা। ও আমাকে লাথি মারতে গিয়ে পড়ে গিয়েছে। আমি জল চেয়েছিলাম! ইচ্ছে করলে ওর তলোয়ার নিয়ে ওকে কেটে ফেলতে পারতাম। কিন্তু করিনি। আমার সঙ্গে বাদশাহ কাল দেখা করবেন। তাই অপেক্ষা করছি। ও এসে শুধু শুধু আমাকে জ্বালাতন করছে।

ওরা রহমৎ-এর কাঁধ ধরে ঠেলে বাইরে বার করে নিয়ে যায়।

এত বিপদের মধ্যেও পৃথ্বীর হাসি পায়। এই হাসি খুবই ক্ষণস্থায়ী সে জানে। তাকে পালাতে হবে। বন্দুক আছে ওদের। নজরে পড়লেই গুলি করবে। আর পালাতে না পারলে যন্ত্রণা দিয়ে মারবে তাকে।

মা কিংবা রুক্মিণী ভাবতে পারছে না কতটা বিপদের মধ্যে পড়েছে সে। মা জানে না, বাবার তলোয়ার আজ হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। নন্দিনীকে আর কখনো সে পাবে না। দিনের বেলায় যে অশ্বশালায় সে কাজ করেছে নন্দিনীর স্থান সেখানে হয়েছে হয়ত।

পরদিন একটু বেলা হলে সোজাতের সেই পাগল-বেশী লোকটি আসে। সঙ্গে আরও অনেকে।

– চল। বাদশাহ ডেকেছেন। ভাগ্য তোমার খুব ভাল। বাদশাহ নিজেই দেখতে চেয়েছেন তোমাকে।

পৃথ্বী উঠে দাঁড়ায়। দিনের বেলায় চারদিকটা ভাল করে দেখে নিতে হবে। সূর্য ডোবার পরে যদি কোন সুযোগ করে নেওয়া যায়। সে দেখতে দেখতে চলে। এ দিকটা সে এসেছে। তবে এতদূর আসে নি। রাস্তা ধরে চলার সময় একজন অশ্বারোহীকে দূরে দেখে বড় পরিচিত বলে মনে হয়। কাছে আসতেই তার মুখ দেখে চমকে ওঠে। করিমবক্স। সোজাত ছেড়ে এরই মধ্যে আজমীঢ়ে চলে এসেছে করিমবক্স। সে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেনি। কিংবা দুর্গাদাসের সঙ্গে আকবরের আলোচনার বিষয়-বস্তু জানতে পেরে আজমীঢ়ে এসেছে আওরঙজেবকে বলতে। দুর্গাদাসের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হল কিনা কে জানে। আওরঙজেব সব জেনে ফেললে রাজপুতদের হবে শোচনীয় পরাজয়। মাড়োয়ারের স্বাধীনতা লাভের আশা চিরতরে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। মনে মনে ছট্‌ফট্ করে ওঠে সে। করিমবক্সের দিকে পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে চায়। কিন্তু করিমবক্স একবারও তার দিকে তাকায় না। যেন তাকে কোনদিন দেখেনি। সন্ন্যাসী বলেছিলেন, কৃতজ্ঞতার কথা। পৃথিবী কৃতজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা পরিপূর্ণ বটে।

বাদশাহ আওরঙজেব। দিল্লীর শাহানশাহকে এত কাছ থেকে নিজের চোখে দেখতে পাবে কখনো কল্পনা করেনি পৃথ্বী। অথচ আজ তাঁরই সামনে তাকে নিয়ে যাওয়া হল। আসনে উপবিষ্ট ঋজু বৃদ্ধ। মুখে চোখে ভাবে ভঙ্গীতে কী প্রখর ব্যক্তিত্ব। হ্যাঁ, বাদশাহই বটে। পৃথ্বীর মাথা নত হয় এই দীর্ঘদেহী পুরুষকে দেখে। সে অনুমানে বুঝতে চেষ্টা করে যৌবনে এই গৌরবর্ণ ব্যক্তিটিকে দেখতে কী অপূর্ব ছিল।

সোজাতের পাগলবেশী লোকটি আভূমি নত হয়ে অভিবাদন

জানায়। শিবিরে আমীর ওমরাহ্ খুব কমই উপস্থিত রয়েছে।

—জাঁহাপনা। এর নাম পৃথ্বী সিং। দুর্গাদাসের পার্শ্বচর।

বাদশাহ আওরঙজেব বেশ কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন পৃথ্বী সিং-এর দিকে। কী অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

—হুঁ। কিছু বলতে চায়?

—এখনো চেষ্টা করে দেখা হয়নি।

—ঠিক আছে। দুপুরের মধ্যে যদি না বলে, তাহলে অন্যভাবে চেষ্টা করবে। কালকের মধ্যে যদি না বলে তাহলে খতম করে দেবে।

বাদশাহ হাত নাড়িয়ে পৃথ্বীকে নিয়ে যাবার ইঙ্গিত করেন। অনেক কাজ তাঁর। সামান্য একজন রাজপুতের জন্য সময় নষ্ট করা সম্ভব নয়। একমাত্র দুর্গাদাসের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা প্রমাণিত বলেই এতদূর আসতে পেরেছে সে। নইলে রাতে সরাইখানার সামনে শেষ হয়ে যেত।

পৃথ্বী ঘাড় ফিরিয়ে দেখে পেছনে করিমবক্স দাঁড়িয়ে। এতক্ষণে সে বুঝতে পারে তার ধরা পড়ার কারণ। সব কিছুর মূলে করিমবক্স। দু দুবার অপমানিত হব্যর চরম প্রতিশোধ নিয়েছে সে।

পাগল-বেশী লোকটি করিমবক্সকে দেখে মনে হল একটু অবাক হয়। বাদশাহকে কিছু বলবে বলেও বলতে পারল না। সাহস হল না। হয়ত বলতে চাইছিল সোজাতে করিমবক্স কীভাবে পরাজিত হয়েছিল পৃথ্বীর দলের কাছে। বাদশাহ সবই শুনেছেন কি? করিমবক্স কি সব বলেছে? তাহলে, সে নিজে কিভাবে মুক্তি পেল সেকথাও বলতে হয়।

পৃথ্বীকে তার আগের রাতের শিবিরে আর নিয়ে যাওয়া হল না। অনেক আঁকাবাঁকা পথ ঘুরে একটা অতি প্রাচীন অট্টালিকার সামনে এসে থামে তারা। দেখে মনে হয় শের শাহের আমলে তৈরী ওটি।

অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে বাড়িটির আসল রূপ ধরা পড়ে। এটি

একটি কয়েদখানা। কক্ষের পর কক্ষ। কোনটা খুবই ছোট, কোনটা মাঝারি। সব কক্ষেই লোহার মজবুত গরাদ। সেই গরাদের ফাঁক দিয়ে ভেতরের মানুষদের দেখা যায়। কোথাও একাকী একজন বসে—ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রয়েছে। দৃষ্টিতে স্বাভাবিকতা নেই। কোন কক্ষে দুতিন জন মেঝেতে গড়াগড়ি দিচ্ছে। মুখ দিয়ে কাতর ধ্বনি বার হচ্ছে। সবারই পোষাক ছিন্ন, কেউ অর্ধোলঙ্গ। দাড়ি গোঁফ বহুদিনের অযত্নবর্ধিত। কেউ চোখ বুঁজে শিবলিঙ্গের মত স্থির হয়ে বসে রয়েছে। পৃথ্বী বুঝতে পারে এদের ওপর ক্রমাগত অত্যাচার চালানো হচ্ছে। ফলে এদের মধ্যে অনেকেই আর প্রকৃতিস্থ নেই।

একজন লোহার গরাদ দুহাত দিয়ে চেপে ধরে ফিক্‌ফিক্‌ করে হেসে বলে ওঠে—ওরে নতুন অতিথি এসেছে। দেখে যা।

সঙ্গে সঙ্গে অনেকে ছুটে এসে দাঁড়ায় তার পাশাপাশি। পৃথ্বী লক্ষ্য করে কারও দেহই অক্ষত নয়। কারও দাঁত ভাঙা। দু'একজনের কান কাটা। কারও হাতের নখগুলো নেই। তবু ওরা ছুটে এসে দাঁড়িয়েছে।

পৃথ্বী ভাবে, কী বীভৎস!

সোজাতের সেই লোকটি হেসে বলে—কেমন দেখছ?

—এরা সবাই কি দুর্গাদাসের অনুচর?

—না না। এদের মধ্যে অনেকে সাধারণ অপরাধী। মুঘল সৈন্যও রয়েছে কিছু কিছু। বাদশাহ বিশৃঙ্খলা ও বিশ্বাসঘাতকতা বিশেষ পছন্দ করেন না। তবে অধিকাংশই তোমার মত রাজপুত। তুমি অনেক উঁচুদরের। তাই ওপরে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে।

পৃথ্বী বুঝতে পারে তার ওপর অত্যাচারের মাত্রা সাধারণ কয়েদীর চেয়ে অনেক উন্নত ধরণের হবে। মনে মনে সে ঈশ্বরের কাছে শক্তি প্রার্থনা করে। কোন ভাবেই যেন দুর্গাদাসের অবস্থান ও তাঁর পরিকল্পনার কথা মুখ থেকে বার না হয়।

ওপরে দুজন লোক দাঁড়িয়েছিল যাদের দেখে পৃথ্বী দৃষ্টি ফেরাতে

পারে না। একজন শক্তিশালী—বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। অপরজনের বয়স অনুমান করা অসম্ভব। তার শরীর সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে। তার দৃষ্টিতে কোন ভাষা নেই। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সেই দৃষ্টি।

পৃথ্বীকে দরজার সামনে এনে দাঁড় করাতেই শক্তিশালী লোকটি তাকে সজোরে লাথি মারে। সে ভেতরে ছিট্‌কে গিয়ে পড়ে। তার মাথা অন্যদিকের দেয়ালে ঠুকে যায়। মুহূর্তের জন্য মনে হয় সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। কোমরে অসহ্য ব্যথা। মনে হয় হাড় ভেঙে গিয়েছে।

একটু স্থির হয়ে ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে দেখে সোজাতের সেই লোকটি ওদের দুজনকে হাসতে হাসতে কী যেন বলছে। একটু পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি ঝুঁকতে ঝুঁকতে এগিয়ে আসে তার দিকে। লোকটির হাতে একটা কিছু রয়েছে। কিন্তু কক্ষটি আলোকিত নয় বলে সে বুঝতে পারে না।

লোকটি আস্তে আস্তে তার পাশে বসে পড়ে। অত্যন্ত সযত্নে তার একটা হাত তুলে নেয়। তারপরই প্রচণ্ড ব্যথায় তার মুখ দিয়ে কাতরোক্তি বার হয়। একটা ধারালো সূচ বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে তার হাতের তালুতে।

সোজাতের মানুষটি এগিয়ে এসে বলে—কিছু মনে করো না পৃথ্বী সিং। এরা দুজনা নতুন অতিথিকে অভ্যর্থনা না করে থাকতে পারে না। এটা বিশেষ কিছু নয়। বাদশাহ বলেছেন, তোমার ওপর প্রথমে কোন অত্যাচার করা হবে না। আমি বর্ণে বর্ণে তাঁর আদেশ মেনে চলব।

যন্ত্রণার মধ্যেও পৃথ্বী লক্ষ্য করে কক্ষটিতে শয্যা বলতে কিছুই নেই। দেয়ালের গায়ে ছোপ্ ছোপ্ দাগ। অন্ধকারে ঠিক বোঝা যায় না। মনে হয় রক্তের দাগ। মাথা ঠুকে ঠুকে মেরে ফেলেছে বোধহয় আগের হতভাগাদের। সে চেয়ে চেয়ে দেখে সব। কিন্তু সামনের

দণ্ডায়মান ব্যক্তিটির দিকে চাইবার কিছুমাত্র স্পৃহা থাকে না। তাই দেখতে পায় না তার অবহেলায় মুঘলটির মুখে কত রকমের হিংস্র রেখা ফুটে ওঠে। দেখতে পায় না তার চোখে শ্বাপদের চাহনি।

– পৃথ্বী সিং।

নিজের আহত হাত অপর হাত দিয়ে চেপে ধরে সে বলে – বল।

– আমার দিকে চাও।

– বল। তুমি খুব বুদ্ধিমান। ভবিষ্যতে তোমার প্রশংসা করব আমি।

– ভবিষ্যৎ? সে ভবিষ্যৎ তোমার জীবনে আর আসবে না। শোন। দীর্ঘ সময় তোমার কাছে আমি থাকব না। আমি শুধু একবার প্রশ্ন করব। তুমি উত্তর দেবে। যদি না দাও, সূর্য ডোবার আগে থেকেই এই জলিল আর আজিজ তাদের কাজ শুরু করে দেবে। চলবে কাল দুপুর পর্যন্ত। তারপর সব শেষ। এরা কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে তুমি কল্পনা করতে পারবে না। আমার মন খুব নরম। এদের অত্যাচারের দৃশ্য সহ্য হয় না। একদিন তো পালিয়ে গিয়েছিলাম। অথচ বাদশাহ নিজে ডেকে এখানকার ভার দিয়েছেন সোজাত থেকে ফিরে আসার পরে।

– তুমি চলে এলে কেন? বাদশাহজাদা তোমার মত মানুষের অভাবে অরক্ষিত হয়ে পড়বেন।

– ফালতু কথা ছাড়ো। ওতে সুবিধা হবে না। তবু বলে রাখি বাদশাহজাদা একজন নন। কিন্তু বাদশাহ একজনই।

– কিংবা বাদশাহজাদা হয়ত পালিয়ে আসছেন। তুমি আগে এসে পৌঁছে খবরটা দিয়েছ।

– চোপ রও। শোন, তোমাকে আমি একবারই শুধু প্রশ্ন করব। তারপর এদের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে যাব।

পৃথ্বী সিং বুঝতে পারে যেকোন কারণেই হোক রাজপুতদের সঙ্গে আকবরের আলোচনার খবর বাদশাহের কানে এসে পৌঁছোয় নি।

জানলে তাকে নিশ্চিত মৃত্যু পথযাত্রী জেনে হয়ত গোপন করত না।

পৃথ্বী সিং নিশ্চিত হয়ে বলে—তুমি প্রশ্ন করতে পার। উত্তর দেবার হলে নিশ্চয় দেব।

—তুমি এখানে কেন এসেছ? দুর্গাদাস পাঠিয়েছে?

—না। তিনি পাঠাবেন কেন? আমি নিজে থেকেই এসেছি। তবে তিনি জেনেছেন নিশ্চয়।

—কেন এসেছ?

—দেখতে। মুঘলদের কাণ্ডকারখানা দেখতে। দেখতে দেখতে তাদের দুর্বলতাগুলো বুঝতে পারব। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

—বাঃ। চমৎকার। রাজপুতরা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।

—এবারে তাহলে ছেড়ে দাও।

—বেশ বলেছ। আমাদের দুর্বলতাগুলো দুর্গাদাসকে গিয়ে বলার জন্যে ছেড়ে দেব।

—তবে আর সত্যি কথা বলে লাভ কি?

—কিছু নেই। তুমি মিথ্যা বললেও এসে যাবে না। যন্ত্রণায় যখন অস্থির হবে সত্যি কথা তখন আপনা হতে মুখ থেকে বার হবে। এবারে বল দুর্গাদাস কোথায়?

—বললে বিশ্বাস করবে?

—না।

—তবে?

—বললে সেখানে লোক পাঠাব। তারপর মিথ্যা প্রমাণিত হলে আবার অত্যাচার কিংবা হত্যা। একজনের পেছনে আমরা বেশীক্ষণ সময় নষ্ট করি না।

—অর্থাৎ আমার কাছ থেকে সত্য কথা জানলেও আমার মুক্তির কোন সম্ভাবনা নেই। এই তো?

মুঘল কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলে—না, ঠিক তা নয়। সত্য কথা জানতে পারলে দুর্গাদাসকে আমরা খতম করব। ততদিন তোমাকে

বন্দী থাকতে হবে। তবে কোনরকম অত্যাচার তোমার ওপর হবে না। দুর্গাদাসের দলবলকে ধ্বংস করার পর তোমার মুক্তির বিষয় বাদশাহ বিবেচনা করবেন।

– বিশ্বাস কি ?

– সেটুকু বিশ্বাস না করে বন্দীর দ্বিতীয় পথ নেই। এবারে বল দুর্গাদাস কোথায় ?

– তোমার নাম কি ?

– বদমায়েসী ছাড়ো পৃথ্বী সিং।

– আমাকে নাম বললে বিন্দুমাত্র ক্ষতি হবে না তোমার। অথচ মানুষের নাম জানার কৌতূহল সবারই থাকে। আমার মুক্তির কোনই সম্ভাবনা নেই। তবু নাম বলতে এত দ্বিধা কেন ? ভয় ? পাছে আমি পালিয়ে গিয়ে তোমার সর্বনাশ করি ?

ঘৃণায় বিরক্তিতে মুঘল নাসিকা কুঞ্চিত করে বলে – হুঁঃ। তোমাকে আবার ভয়। শোন, আমার নাম আয়ুব খাঁ। আমার কি কাজ, সেকথা কবরের মড়াকেও বলব না। এবারে বল দুর্গাদাস কোথায় ?

পৃথ্বীর হাতের তালু ব্যথায় টনটন্ করছিল। রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। সে লক্ষ্য করে দরজার কাছে সেই দুজন দুশমন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। দেয়ালের গায়ে ছোপ্ ছোপ্ দাগ।

সে আয়ুব খাঁকে বলে – তোমাকে একটা কথা বলে নিশ্চিন্ত করতে চাই।

– বল, কি কথা।

– দুর্গাদাস কোথায় আছেন, সেকথা জানলেও বলতাম না।

– এই তোমার শেষ কথা ?

– হ্যাঁ।

– জলিল।

ওরা দুজন এগিয়ে আসে। একজনের হাতে ছোরা এবং দড়ি। পৃথ্বী ভাবে, ওর হাতে ছোরা এল কোথা থেকে ? ছোরা দিয়ে করবেই

বা কি ? বুকে বিঁধিয়ে দিলে তো সব শেষই হয়ে গেল।

শক্তিশালী লোকটি আয়ুবকে প্রশ্ন করে—ওর কাছ থেকে কি বার করতে হবে ?

—দুর্গাদাস কোথায় ? তাকে কোথায় পাওয়া যাবে ।

—বহুত আচ্ছা ।

আয়ুব খাঁ ঘর থেকে বার হয়ে যায় । সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজন পৃথ্বীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার হাত-পা বেঁধে ফেলে ।

গভীর রাতে করিমবক্স পৃথ্বীর কক্ষে প্রবেশ করে । চোখে কিছুই দেখতে পায় না। শুধু একটা অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ আসে কোণ থেকে। সে ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে যায়। তারপর হাতের বাতি জ্বালিয়ে নেয়। পৃথ্বীর হাত-পা বাঁধা নেই। কিন্তু তার ডান হাতখানা বীভৎসভাবে ক্ষত বিক্ষত। তার নাক মুখ ফুলে রয়েছে। হাতের ক্ষতে সম্ভবত মরীচের গুঁড়ো দেওয়া হয়েছে । ফালা ফালা করে কাটা ডান হাতখানা ।

করিমবক্স চোখ বন্ধ করে ফেলে মুহূর্তের জন্য। তারপর পৃথ্বীর পাশে বসে পড়ে। অনেক রক্তক্ষরণ হয়েছে তার শরীর থেকে। সে অর্ধ-অচেতন। যন্ত্রণা আর দুর্বলতার জন্য আচ্ছন্ন ভাব।

—পৃথ্বী— পৃথ্বী সিং ।

—না না। আমি জানি না। জানলেও বলব না। মেরে ফেলো আমায় ।

—পৃথ্বী সিং, তোমার কি জ্ঞান আছে

বহুদূর থেকে যেন, পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। সেই রকমই মনে হল পৃথ্বীর। কোথায় শুনেছে এই কণ্ঠস্বর ? অমর সিং ? না না। দুর্গাদাস ? না, তিনিও নন। তবে বোধহয় সে স্বপ্ন দেখছে।

—পৃথ্বী সিং। একবার তাকাবে ?

না না। খুব কাছ থেকে যেন কেউ ডাকছে। সে ঘুমিয়ে ছিল,

তাই অমন মনে হচ্ছিল। কিন্তু কোথায় সে? এত যন্ত্রণা কেন?

—পৃথ্বী?

চোখ মেলে পৃথ্বী সিং। বাতির মৃদু আলোও তার চোখে অসহনীয় বলে মনে হয়। করিমবক্স অবাক হয়। পৃথ্বীর অসাধারণ স্বাস্থ্য আর মানসিক বল শুধু তাকে জীবিত রাখেনি—সচেতনও রেখেছে কিছুটা।

—পৃথ্বী সিং, আর একবার চেয়ে দেখো।

এবারে পৃথ্বী ঝোঁকের মাথায় ধীরে ধীরে উঠে বসতে চায়।

—না না। তুমি শুয়ে থাকো। এত তাড়াতাড়ি উঠো না।

—কে? কে তুমি?

—আমি করিমবক্স।

—করিমবক্স! তুমি নিজে এলে শেষ পর্যন্ত! একেবারে মেরে ফেলবে বুঝি!

—না। না পৃথ্বী।

—বাঁচাবে? এত যন্ত্রণার মধ্যেও পৃথ্বীর কথায় বুঝি বিদ্রূপ।

—আমাকে বিশ্বাস কর পৃথ্বী।

—করিমবক্স। আর কেন? দুবারের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে যাও। এই অন্ধকারই ভাল। বাতিটা নিভিয়ে দাও। তোমার মুখ দেখতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে।

—ভুল বুঝোনা পৃথ্বী।

—না। ভুল বুঝব কেন?

—পৃথ্বী। আমি তোমাকে বাঁচাতে এসেছি।

—কী বলছ তুমি। অনুতাপের উচ্ছ্বাস?

—না না। সত্যি। কিন্তু সময় বড় কম। তুমি কি উঠতে পারবে?

—আহত মানুষের সঙ্গে পরিহাস কেন করিমবক্স?

—পৃথ্বী, তুমি জান না, জীবনে এইটিই তোমার শেষ সুযোগ।

দেরি করলে সুযোগ হারাতে হবে।

করিমবক্সের চোখের দিকে এতক্ষণে পৃথ্বী ভালভাবে দৃষ্টি ফেলে। কোনরকম কুটিলতা নেই। রয়েছে শুধু আকুতি।

সে অস্ফুটস্বরে বলে— সত্যি বলছ ?

—হ্যাঁ পৃথ্বী। এর চেয়ে সত্যি আর নেই।

—কিন্তু তুমি ভীষণ বিপদে পড়বে।

—জানি। তবু তোমায় বাঁচতেই হবে।

—না থাক।

আমি সঙ্কল্প নিয়ে এসেছি। ওঠো পৃথ্বী।

—ওই জল্লাদরা ? ওরা দেখে ফেলবে না ?

—আফিমের ঘোরে অজ্ঞান। অভ্যাস ওদের বরাবরই আছে। আজ একটু বেশী মাত্রায় দেবার ব্যবস্থা করেছি।

—কি করে যাব ? নন্দিনী নেই।

—আছে। নন্দিনীও আছে। তোমার তলোয়ারও আছে। কেমন করে ? সেই প্রশ্ন আজ আর করো না। সুযোগ পেলে পরে বলব।

পৃথ্বী প্রথমে চেষ্টা করেও উঠতে পারে না। শেষে করিমবক্সের সহায়তায় উঠে দাঁড়ায়। তাঁর ডান হাতখানা অবশ। চুইয়ে চুইয়ে রক্ত ঝরছে। বাঁ হাতও একেবারে অক্ষত নয়। ওটি ভোর রাত থেকে ফালা ফালা করে কাটবে বলে জানিয়ে গিয়েছিল জলিলরা। রক্তক্ষরণে সে দুর্বল। মাথা ঘুরে ওঠে। তবু করিমবক্সের কাঁধে ভর দিয়ে সে এক পা এক পা করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে।

নীচটা নিস্তব্ধ। শুধু গোঙানির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে দু একটি কক্ষ থেকে। একজন অন্ধকারের মধ্যে শিক ধরে ফিসফিস করে বলে ওঠে— নিয়ে চলল তোকে ? আমাকে নেবে না ? আমিও মরতে চাই।

ওরা বাইরে আসে।

পৃথ্বী রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলে—আমি বোধহয় পারব না করিমবক্স।

—তোমাকে পারতেই হবে পৃথ্বী। ধর যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি আহত হয়েছ। শত্রুরা পালিয়েছে। কি করতে তুমি ?

—এখনো রক্ত পড়ছে। মাথা ঘুরছে।

—জানি। তবু এই তোমার শেষ সুযোগ। পালাতে গিয়ে মৃত্যু হলেও সেটা হবে স্বাধীন মৃত্যু। তুমি না স্বাধীনতাকে ভালবাস ? কালকে তোমার এমনিতেই মৃত্যু হত।

নন্দিনী দাঁড়িয়েছিল অন্ধকারের মধ্যে। করিমবক্সের সহায়তায় পৃথ্বী নন্দিনীর পিঠে চেপে বসে।

—সোজা চলে যাও তোমার গাঁয়ে। পথে কোন রাজপুতের গৃহে আশ্রয় নিও। খুব সাবধান। সব রাজপুত সমান হয় না। নন্দিনীকে লুকিয়ে রাখতে ভুলো না।

পৃথ্বী জানে, গোপনে এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করা এই অবস্থায় অসম্ভব। তবু সে এগিয়ে চলে। করিমবক্স খুব দামী কথা বলেছে। এভাবে মৃত্যু হলে সেটা হবে স্বাধীনভাবে মৃত্যু। সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ে! পৃথিবী থেকে কৃতজ্ঞতা এখনো অবলুপ্ত হয়নি। এই কাজের জন্যে করিমবক্সকে বিশ্বাসঘাতক হতে হল কি ? ভাবতে পারে না পৃথ্বী সিং। সে বুক ভরে শ্বাস নেয়।

পৃথ্বীর আঘাত খুবই গুরুতর। তার হাতের বহু জায়গায় একাধিক বার ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে। আহত স্থানগুলো রীতিমত গভীর। শরীরের অনেক রক্ত বার হয়ে গিয়েছে। তাকে সাহায্য করে নন্দিনী। নন্দিনী বুঝতে পারে যে-মানুষটিকে সে বহন করে অভ্যস্ত তার দেহে কিছুমাত্র বল নেই। হাটু দিয়ে সে যেভাবে চেপে ধরে বরাবর সেভাবে চেপে নেই আজ। তার হাতের লাগামও ঢিলে। লাগাম কত সময় হাত থেকে খসে পড়েছে। তখন দাঁড়িয়ে পড়েছে নন্দিনী।

এইভাবে চলতে চলতে পরের দিন একটি পার্বত্য গ্রামে গিয়ে পৌঁছোয় তারা। গ্রামের অশ্বত্থ তলায় পৌঁছোতেই এক অতিবৃদ্ধ তাকে দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে কাছেই তার কুটিরে নিয়ে যায়।

সে বলে – ওভাবে এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়?

– কেন? দোষ আছে? আমি আর পারছিলাম না।

– দেখতেই পাচ্ছি। তুমি এখনো বেঁচে আছো দেখে অবাক হচ্ছি। তবু তোমাকে যে-কেউ দেখে ফেলতে পারত।

– তাতে কি হল? আপনারা তো রাজপুত।

– হুঁ রাজপুত। কত রাজপুত বাদশাহের গোলামী করে খেয়াল রাখো? তোমাকে একবার দেখলেই বোঝা যায় তুমি দস্যু নও। তাহলে কি? বাদশাহের লোক? কেউ বিশ্বাস করবে না। তবে তুমি কি? এক কথায় বাদশাহের শত্রু। এবার বুঝলে ব্যাপারটা?

বৃদ্ধের বয়স তার উপস্থিত বুদ্ধিকে ভোঁতা করে দেয় নি। পৃথ্বী ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানায়। বৃদ্ধ একবারও তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল না। একটুও কৌতূহল প্রকাশ করল না, কোথা থেকে আসছে জানার জন্য।

বৃদ্ধ শুধু বলল – আমি তোমার কিছুই জানতে চাইব না। আমি শুধু জানি তোমার এই ক্ষত যুদ্ধক্ষেত্রের ক্ষত নয়। তোমার ওপর নিশ্চিন্ত মনে দারুণ ভাবে অত্যাচার করা হয়েছে। আমার উচিত তোমাকে অন্তত দিন পনেরো রেখে কিছুটা নিরাময় করে তোলা। কিন্তু আমি পারব না। আমার ছেলে কাল ফিরবে।

বৃদ্ধ তার ক্ষতস্থান খুব ভালভাবে পরিষ্কার করে বেঁধে দেয়। তাতে একটু বেশী রক্ত পড়লেও সে অনেক আরাম বোধ করে। নিজের চোখে হাতের মাংসের ভেতর থেকে হাড় দেখা বড়ই অস্বস্তিকর। বৃদ্ধ তাকে খেতে দেয়। নন্দিনীর পরিচর্যা করে। কিছুটা শুকনো খাবার সঙ্গে দিয়ে দেয়।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে বলে—এইবার তুমি রওনা হও। তোমাকে এভাবে ছেড়ে দেওয়ায় নিজেকে অপরারী বলে বোধ হচ্ছে। তবু উপায় নেই।

—আপনি যথেষ্ট করেছেন।

পৃথ্বী আবার নন্দিনীর পিঠে ওঠে। আগের চেয়ে ও আরাম বোধ করলেও তার গা আরও গরম হয়ে ওঠে। বার বার তৃষ্ণা পেতে থাকে।

চলতে চলতে কত সময় তার চোখ অন্ধকার হয়ে যায়। কত সময় চেতনা থাকে না। তবু নন্দিনী ঠিক এগিয়ে চলে। সে ছুটতে পারে না। উঁচু নীচু জায়গায় লাফাতেও পারে না।

এক একসময় সজাগ হয়ে পৃথ্বী বলে ওঠে—চল্ নন্দিনী, চল্। জোরে চল্।

নন্দিনী কিছুটা পথ জোরে চলে। তারপর বুঝতে পারে তার আরোহীর হাতের লাগাম ঢিলে, তার হাঁটুর চাপ নেই পেটের দুই পাশে। সে আবার ধীরে ধীরে চলতে শুরু করে।

এইভাবে আরও কয়েকদিন কাটে। যারা আশ্রয় দিয়েছে, তারা শুশ্রূষা করেছে। নানান প্রশ্ন করেছে। পৃথ্বী শুধু বলেছে, তোমরা আমাকে কোন প্রশ্ন করো না। যদি সাহায্য করতে হয় কর। নইলে যেতে দাও। ইচ্ছে করলে মেরেও ফেলতে পার।

না, মারেনি কেউ। বরং তার ক্ষাতস্থান পরিষ্কার করে দিয়েছে।

নইলে এই কদিনে পচন ধরত। পৃথ্বীর সৌভাগ্য যে ক্ষতস্থান পরিচর্যায় রাজপুতদের অনেকেই পারদর্শী। কারণ অক্ষত-দেহ রাজপুত দেশে একজনও মিলবে কিনা সন্দেহ—শিশু আর নারী ছাড়া। পচন না ধরলেও পৃথ্বীর মৃত্যু হতে পারত। কিন্তু সামর্থের শেষ সীমায় পৌঁছেও সে এগিয়ে চলেছে। কারণ দুর্গাদাসের কাছে পৌঁছোবার তীব্র আকাঙ্খা রয়েছে তার মনে। আর রয়েছে মা এবং রুক্মিণীর কাছে গিয়ে নিশ্চিন্ত হবার ইচ্ছা। এতেই সে শক্তি পেয়ে

জীবন্মৃত অবস্থায় এগিয়ে চলেছে।

শেষে এক মধ্যাহ্নে ঘোলাটে চোখেও অদূরে সেই অতি পরিচিত পাহাড়টি নজরে পড়ে যায় তার। তার জন্মস্থান। বহিন বয়ে চলেছে ওখানে কুল্‌কুল্‌ স্বরে। এই প্রথম পৃথ্বী ভরসা পায়। সে নিশ্চয় সেরে উঠবে। মা রয়েছে। রুক্মিণী রয়েছে। সেরে উঠে সে আবার দুর্গাদাসের কাছে ফিরে যাবে।

ঠিক সেই সময় দূরে পেছনে একজন অশ্বারোহীকে প্রাণপণ শক্তিতে ছুটে আসতে দেখা যায়। কে এই অশ্বারোহী? ধুলো উড়ছে। কে হতে পারে? পৃথ্বী তার চোখের দৃষ্টি যতটা পারে স্বচ্ছ করে তাকায়। মুঘল মনে হচ্ছে। শেষে এত কাছে এসে তাকে মরতে হবে?

—নন্দিনী। শিগ্‌গির। আমাকে বহিনের কাছে নিয়ে চল্‌। সেখানে খুঁজে পাবে না।

অবশিষ্ট যেটুকু শক্তি রয়েছে শরীরের তাই নিয়ে পৃথ্বী সোজা হয়ে বসে। কিন্তু পেছনের অশ্বারোহী অতি সহজেই তার দূরত্ব ধীরে ধীরে কমিয়ে আনছে। তার অশ্ব বেশ বড় এবং তেজী। নন্দিনীকে অনেকদিন অযত্নে থাকতে হয়েছে। আহারও জোটেনি ঠিকমত। তাই সে ক্লান্ত। তবু অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে সে পৃথ্বীর কথায়। তাই প্রাণপণ ছুটছে। সে জানে বহিন কোথায়। সে জানে, কোনটা সহজতম পথ—পথের কোথায় কোন পাথর কিভাবে টপ্‌কাতে হবে।

পাহাড়ে এসে পেছনের অনুসরণকারীকে স্পষ্ট দেখতে পায় পৃথ্বী। সে যে মুঘল এবিষয়ে এখন আর একটুও সন্দেহ নেই। তার লক্ষ্য পৃথ্বী। আজমীঢ় থেকে আসছে কি? কিন্তু একা কেন? বাদশাহ নিশ্চয় অগ্নিশর্মা। তাই যে যেদিকে পারে দলে দলে বার হয়ে পড়েছে।

পৃথ্বীর অবশিষ্ট শক্তিটুকুও নিঃশেষিত হয়ে আসে। তার চোখের

দৃষ্টি আবার ঝাপসা হয়ে পড়ে। সে পৌঁছোতে চায় বহিনের পাশের সেই অতিপরিচিত পাথরটির কাছে যার ওপর তার জন্ম হয়েছিল। মৃত্যু যখন অবধারিত, তখন সেখানেই হোক। ওই পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে শেষ বারের মত সে তলোয়ার ধরবে। তার পিতার তলোয়ার। তারপর ওরই ওপর লুটিয়ে পড়বে। সালাম করিমবক্স। ভীষণ বিপদের ঝুঁকি নিয়েও তুমি যা করেছ তার তুলনা নেই। ঈশ্বর তোমায় নিরাপদে রাখুন।

নন্দিনী তাকে বহিনের পাশে নিয়ে এসে থেমে যায়। সামনে পথ বন্ধ। এখুনি অনুসরণকারীও নেমে আসবে এখানে। নন্দিনীর পিঠ থেকে নেমে পৃথ্বী তলোয়ারটি হাতে নিয়ে টলতে টলতে চলে পাথরটির কাছে। তারপর অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ায় সেই পাথরটির ওপর।

—বহিন, আমার এইটুকু সান্ত্বনা যে তোমার পাশে মরব।

ওপর থেকে নেমে আসছে আশ্বারোহী। পৃথ্বী খুব পরিষ্কার দেখতে পায় না। সে একটা অট্টহাসি শুনতে পায়।

—কোথায় পালাবে পৃথ্বী। জাহান্নামে গেলেও আয়ুব খাঁয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। কেউ পায়নি এ পর্যন্ত। তোমাকে খতম করে সেই বিশ্বাসঘাতকের ব্যবস্থা করব। জানি, সে করিমবক্স।

সেই আয়ুর খাঁ। সোজাতের সেই পাগল। ঘোড়া থেকে নামতে হয় আয়ুব খাঁকেও। কারণ পাথরের কাছ পর্যন্ত ঘোড়া আসতে পারে না। পৃথ্বী আবছা দেখতে পায় আয়ুব এগিয়ে আসছে। সে নিজেও তার তলোয়ায় নিয়ে প্রস্তুত থাকে।

সেই সময় একটা গর্জন। একটা আর্তনাদ!

কি হল? আয়ুর খাঁ এলো না তো? কে আর্তনাদ করল। তবে কি অমর সিং এসেছিল? তাকেই আগে আক্রমণ করল আয়ুব খাঁ।?

পৃথ্বীর সামনের দৃশ্য অন্ধকারে মিশে যায়। সে অচেতন হয়ে

পাথরের ওপর লুটিয়ে পড়ে। তার হাতের তলোয়ার হাত থেকে ফসকে পাথরের ওপর পড়ে আওয়াজ তুলে বহিনের কিনারায় গিয়ে থেমে যায়। তার অগ্রভাগের ওপর দিয়ে বহিনের জল কুল্ কুল্ করতে করতে বয়ে যায়।

অনেকটা সময় কেটে যায়। ধীরে ধীরে পৃথ্বীর চেতনা ফিরে আসে। সে অনুভব করে কে যেন তার চোখের ওপর ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। চোখ মেলেও বুঝতে পারে না কিছুক্ষণ। তারপর এক হাত বাড়িয়ে অনুভব করে ঘন ঘন লোম।

—অস্ফুট স্বরে সে বলে—ভুলুয়া? তুই এসেছিস্? আমি বেঁচে আছি?

ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করে ভুলুয়া। তার লোম দিয়ে পৃথ্বীর গা ঘষে দেয়।

পৃথ্বী অনেক কষ্টে উঠে বসে। কিছুক্ষণ ফাঁকা দৃষ্টিতে চারদিকে চায়। তারপর খুব ধীরে পাথর থেকে বহিনের জলে নামে। কত দিনের তৃষ্ণা যেন বুকের মধ্যে আঁধি তুলেছে। সে আঁজলা ভরে জল পান করে। জল পান শেষ হলে সে দেখে তার তলোয়ারখানা পড়ে রয়েছে। সেটি তুলে নিতে গিয়ে আয়ুব খাঁর কথা মনে পড়ে যায়। চমকে ওঠে সে। চকিতে চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। গেল কোথায় সে?

এদিকে ওদিকে চেয়ে নন্দিনীর পাশে আর একটি অশ্বকে দেখতে পায়। হ্যাঁ, এই তেজী সাদা ঘোড়াতেই সে ছুটে আসছিল বটে। সে পাথরের ওপর উঠে দাঁড়ায়। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পায় আয়ুব খাঁকে। পাথর থেকে মাত্র দশ হাত দূরে পড়ে রয়েছে সে। দেহ তার ক্ষতবিক্ষত।

—একি! ভুলুয়া! তুই করেছিস্ এই কাণ্ড?

অদ্ভুত আওয়াজ করে ওঠে ভুলুয়া। তখনই পৃথ্বীর নজরে পড়ে ভুলুয়াও একেবারে অক্ষত নেই। আয়ুব অন্তত একবার তার

অস্ত্র চালাবার সুযোগ পেয়েছিল। ভুলুয়ার ঘাড়ের কাছে ক্ষত। সেই ক্ষত থেকে একটু একটু রক্ত ঝরছে।

সন্ন্যাসীজী পৃথিবীতে কি সবাইকেই কৃতজ্ঞ হতে হয়?

পৃথ্বী ভুলুয়ার ক্ষতস্থান পরিচর্যার জন্য পরিচিত লতাগুল্ম খুঁজতে শুরু করে।

খুবই আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়েছিল আয়ুব খাঁ। নইলে তার মত শক্তিশালী পুরুষের মৃত্যু তো দূরের কথা আহত হবারও কথা নয়। সামনে আহত আর ক্লান্ত পৃথ্বীকে দেখে সে সব কিছু ভুলে গিয়ে নিজেকে এতবেশী অরক্ষিত করে ফেলেছিল যার ফলে ভুলুয়া তাকে প্রথম আক্রমণেই ধরাশায়ী করে ফেলে। তখন অস্ত্র চালিয়েও বিশেষ কোন লাভ হয়নি।

ভুলুয়ার ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়ে পৃথ্বী ধীরে ধীরে ওঠে। ক্লান্ত হলেও সে নিশ্চিন্ত। সে আয়ুবের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। শান্ত মুখে নিদ্রা যাচ্ছে যেন। গৌরবর্ণ শরীরের গোলাপী আভা অন্তর্হিত হয়ে ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। পৃথিবীর কারও প্রতি কোনরকম রাগ দ্বেষ ঈর্ষা ঘৃণা কিছুই লেখা নেই ওই মুখে। এখন ও মুঘলও নয়, রাজপুতও নয়। এখন ও মানুষের শবদেহ। গ্রামে গিয়ে অমর সিংকে বলতে হবে ওর কথা। কবরের ব্যবস্থা করতে হবে। ওর আপনজন সবাই নিশ্চয় আছে। স্ত্রীও আছে। কিন্তু কেউ কোনদিন জানতে পারবে না কোথায় হারিয়ে গেল তাদের প্রিয়জন। কেমন করে হারিয়ে গেল। এইটুকু হয়ত সান্ত্বনা পাবে যে কোন যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত লড়ে সে প্রাণ দিয়েছে। তারা হয়ত জানেই না অতি ক্ষুরধার বুদ্ধির অধিকারী আয়ুবকে বাদশাহ কোন কাজে লাগিয়েছিলেন।

পৃথ্বী বুঝতে পারে তার সেই দুর্বলতা মনের মধ্যে আবার জেঁকে বসতে চাইছে। একটু পরেই হয়ত সে আয়ুবের পোষাক খুঁজতে শুরু করবে, তার বাড়ির ঠিকানা পাওয়া যায় কিনা।

আয়ুবের অশ্বটির লাগাম হাতে নিয়ে সে নন্দিনীর পিঠে ওঠে।

ভুলুয়া ঘোঁৎ করে ওঠে।

— পরে আসব ভুলুয়া। বেশ কিছুদিন তোর সঙ্গে দেখা হবে না। আমি শয্যাশায়ী থাকব। তুই খুব সাবধানে থাকিস।

ভুলুয়া ছুটে গিয়ে আয়ুবের দেহের ঘ্রাণ নেয়।

— ও থাকুক। কাল অমর সিং আসবে। তাকে যেন তাড়া করিস না।

গাঁয়ের পথে চলতে থাকে পৃথ্বী। অমর সিং আয়ুবের অস্ত্র পেলে খুশীই হবে। কিন্তু ঘোড়াটি পৃথ্বী নিজের জন্যে রাখবে। নন্দিনীর চেয়েও এটির বয়স কম।

নন্দিনীর গায়ে হাত বুলিয়ে বিড়বিড় করে বলে — তোকে বাতিল করব না রে। মাঝে মাঝে শুধু বিশ্রাম দেব। কিন্তু দুর্গাদাসের হাতে এই নতুনটাকে দিয়েও আসতে পারি। সে সব পরে ভাবা যাবে। এখন আমি কিছুদিন শুয়ে থাকতে চাই।

সন্ধ্যা হয়ে যায় গাঁয়ের পাশে আসতে। তার শরীর আর মনে শৈথিল্য। তার অশ্বের গতিতে মন্থরতা। বলতে গেলে হাঁটিতে হাঁটিতে চলে। দূরে শিমূল গাছটি কোথায় সে অনুমান করে। তবে আশেপাশের অন্যান্য গাছপালার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার অন্ধকারে।

কে যেন এগিয়ে আসছে দ্রুতপদে। কে? গাঁয়ের দিক থেকেই আসছে। অমর কি? কিংবা আয়ুবের মত শত্রুর অন্য কোন গুপ্তচর? রুক্মিণীর বাড়ি যায় নি তো? পৃথ্বীর রক্তের মধ্যে চনচন্ করে ওঠে। তার দুহাত ব্যথায় টনটন্ করে। তবু সে তলোয়ার খুলে নেয় হাতে। বাড়িতে গিয়ে সে শান্তি চায়। এখন যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে সে রেহাই দেবে না কাউকে। সে দেখতে চায় তার মা সুস্থ রয়েছে। দেখতে চায় রুক্মিণীর কোন অনিষ্ট হয়নি।

— কে? পৃথ্বী চেঁচিয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন হয়ে পড়ে।

লোকটি থমকে দাঁড়ায়। তারপর আরও দ্রুতগতিতে তারই দিকে

এগিয়ে আসে। শত্রু হলে এভাবে আসত না।

অন্ধকারের মধ্যেও পৃথ্বীকে দেখে বিস্মিত হয় আগন্তুক—একি তুমি? তোমার চেহারা এমন হয়েছে কেন?

—সন্ন্যাসীজী!

পৃথ্বী নন্দিনীর পিঠ থেকে নামতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে।

—থাক্ থাক্ নেমোনা। তুমি যে সাংঘাতিক আহত দেখছি। মুখ রক্ত-শূন্য দেহ শীর্ণ।

—সন্ন্যাসীজী আমাকে একটু ধরুণ। আমি আপনাকে প্রণাম করব।

—না। এখন নয় পৃথ্বী। পরে করো।

—বাধা দেবেন না।

সন্ন্যাসী পৃথ্বীকে আরও যত্নে ঘোড়া থেকে অবতরণে সাহায্য করেন। পৃথ্বী সন্ন্যাসীর পায়ের ওপর উপুড় হয়ে অনেকক্ষণ মাথা দিয়ে থাকে।

—ওঠো পৃথ্বী। তুমি অসুস্থ। তোমার দেহ গরম। তোমার গায়ে রক্তের গন্ধ। ওঠো বীর। ওভাবে মাথা রাখলে মাথা নত হয়ে যাবে।

পৃথ্বী উঠে বসে বলে—না। এতে মাথা আরও উন্নত হয়।

সন্ন্যাসী পৃথ্বীকে আনন্দ দেবার জন্য রসিকতা সুরু করেন। বলেন—হঠাৎ এত ভক্তির ঘটা কেন? দেখছ না, কেদার-বদ্রী যাব বলেও যেতে পারলাম না। আমি সাধু নাকি যে ঘটা করে প্রণাম করছ?

—আপনি আমার গুরু।

—বলছ কি পাগলের মত। এবার আমাকে পালাতে হবে দেখছি। চল তো। আগে বাড়ি চল। তোমার এই নতুন বাহনটির আরোহীর দেহ কোথায় রেখে এলে?

বিস্মিত পৃথ্বী বলে ওঠে—কি করে জানলেন?

—ভেবোনা, গুনে বলেছি। ওঠা সাধারণ জ্ঞান।

পৃথ্বীকে আবার নন্দিনীর পিঠে তুলে দিয়ে তিনি আয়ুব খাঁর ঘোড়াটিতে চেপে বসেন।

—চল। এই রকম আহত তুমি? যুদ্ধ করলে কার সঙ্গে?

—যুদ্ধ নয়। একতরফা। একজন ছুরি দিয়ে বসে বসে নিশ্চিন্তে আমার হাতের একই জায়গায় বারবার ঘষেছে। তারপর হাড় বার হলে, আর এক জায়গায়। আমার হাত-পা বাঁধা ছিল। তারপর এক একবার কেটেছে আর সযত্নে মরীচের গুঁড়ো ছিটিয়েছে।

সন্ন্যাসীর শান্ত মুখও বোধহয় একটু বিকৃত হয়। তিনি বলেন—বুঝেছি। আজমীঢ়ে।

—হ্যাঁ।

—হত্যা না করে এভাবে ছেড়ে দিল কেন?

—ছাড়েনি। পালিয়ে এসেছি।

—পালিয়ে এসেছ? এ যে অসম্ভব!

—হ্যাঁ। কিন্তু সন্ন্যাসীজী, পৃথিবীতে সবারই বোধহয় কৃতজ্ঞতা বোধ আছে।

—বাঃ! মতটা একেবারে পাল্টে ফেলেছ দেখছি।

—আমি—

—আর কথা নয়। পরে শুনব। সব শুনব। এখন প্রথম কাজ তোমাকে সুস্থ করে তোলা। আমি খোঁজ নিতে এসেছিলাম কে কেমন আছে। পুরুষ বলতে গাঁয়ে তো একা অমর সিং।

—কেমন ছেলে? আপনাকে তো গুপ্তচর ভেবেছিল।

—ওর তুলনা হয় না পৃথ্বী। ও থাকতে তোমাদের কারও কোন ভাবনা নেই। নিশ্চিন্তে বাইরে পড়ে থাকতে পার।

—ওটা একটা পাগল।

—অমন পাগলে পৃথিবী ভরে যায় না কেন?

—তাহলে যে যুদ্ধ উঠে যাবে পৃথিবী থেকে। নবাব-বাদশাহ রাজা-মহারাজা সবাই ওর মত হলে রাজভাণ্ডার পূর্ণ হবে কি করে?

পাশের রাজ্যকে পদানত না করতে পারলে গর্ব করার কি থাকবে ?

– চুপ। আর কথা নয়। তোমার গলা কাঁপছে। রুক্মিণীর বাড়ির সামনে দিয়ে চুপচাপ চলে যেতে হবে। আগে থাকতে বলে দিচ্ছি।

কিন্তু শিমূল গাছের কাছে এসে সন্ন্যাসীর ঘোড়াই কেন যেন ছট্‌ফট্ শুরু করে। তিনি তাকে ধমক দেন।

রুক্মিণী ছুটে বার হয়ে আসে হাতে আলো নিয়ে – কি হল সন্ন্যাসীজী ? ঘোড়া জোটালেন কোথা থেকে ?

সেই সময় সারা হাতে কাপড়-জড়ানো পৃথ্বীর দিকে চেয়ে সে স্তব্ধ হয়ে যায়। এই কি তার পৃথ্বী। এ কি চেহারা হয়েছে তার। চোখ ফেটে অশ্রু ঝরে পড়ার উপক্রম হয়।

সন্ন্যাসী চেঁচিয়ে বলেন – আর বলো কেন ? এই পৃথ্বীটা আহত হয়ে এসেছে। এখন দাঁড়াবো না বোন। আমরা চলি। পৃথ্বীর পেছনে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। তুমি চলে এসো। আমি তো থাকতে পারব না। দুর্গাদাসকেও খবরটা পৌঁছে দিতে হবে।

বেশ কিছুদিন পরে রুক্মিণীকে দেখে পৃথ্বীর মন শান্তিতে ভরে ওঠে। রুক্মিণীর চোখে দেখেছে সে তীব্র ব্যাকুলতা। তার বুক আবেগে ওঠা-নামা করছিল। রুক্মিণী কত কিছু বলতে চাইল। কিন্তু মুখ দিয়ে কথা সরল না। শেষে বাতি নিয়ে ছুটে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। একটু পরেই সে তার বাড়িতে আসবে। কথাটা ভাবতেই, তার সমস্ত ক্লান্তি একযোগে তাকে অভিভূত করে ফেলল। যে অসীম মনোবল নিয়ে গত কয়েকটা দিন নিজেকে সে সোজা রেখেছিল সেই শক্তি সে সহসা হারিয়ে ফেলল। বুঝল, আর দরকার নেই। এবারে সে তার মা আর রুক্মিণীর ওপর সব কিছু ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

অনেক রাতে মা ঘুমিয়ে পড়লে রুক্মিণীর কোলে মাথা রেখে পৃথ্বী শুয়ে থাকে। ভেবেছিল একটানা নিশ্চিন্তে ঘুমোবে। কিন্তু ঘুম আর আসে না। তাই রুক্মিণী নিজেও বোধ হয় ঘুমোতে পারছে না।

—কতক্ষণ আর জেগে থাকবে রুক্মিণী ?

—অনেকক্ষণ। তুমি ঘুমোও। কিছুতেই ঘুমোতে পারছ না। তোমার কি কষ্ট হচ্ছে ?

—না। একটুও কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু তুমি জেগে থাকছ কেন।

—আমি রোজই ঘুমোই। অত কথা বলছ কেন ?

—ইচ্ছে করছে। আমি বরং দিনের বেলা ঘুমোবো।

—আর রাত্তিরে জেগে থাকবে ? তাহলে সারতে যে দেরি হবে।

—না। ঠিক সেরে উঠব। জান রুক্মিণী. তোমার কথা রোজই মনে হত।

রুক্মিণী হেসে বলে—এ আবার জানতে হয় নাকি ?

—আমার কথা তোমার মনে হত ?

—জানিনা যাও।

—বলো না।

—তোমার কি মনে হয় ?

--কি জানি। তোমার তো অনেক কাজ।

—হ্যাঁ। অনেক কাজ। তাই তোমার কথা মনে হতো না।

—আমি জানতাম! কাজের মধ্যে কিছু মনে থাকে না।

পৃথ্বীর কপালে গাল ঠেকিয়ে রুক্মিণী বলে—না মশায়, তুমি কিছুই জান না।

—তাহলে ? আমার কথা মনে পড়ত ?

—হ্যাঁ।

—রোজ ?

—সর্বক্ষণ।

—যাঃ। তাই হয় নাকি ?

—হয়। তোমার না হলেও আমাদের হয়। এবারে ঘুমোও তো ? নইলে আমি বাড়ি চলে যাব।

—না না। এই তো ঘুমোচ্ছি। এই দেখ।

পৃথ্বী নিমীলিত চক্ষে চুপ করে থাকে। ঘরে টিমটিম করে একটা বাতি জ্বলছিল। সে অনেক কথা বলতে চায় রুক্মিণীকে। কিন্তু রুক্মিণী কিছুতেই বলতে দেবে না। সন্ন্যাসীর মুখে রুক্মিণী শুনেছে কী অমানুষিক অত্যাচার সইতে হয়েছে তার প্রিয়তম ব্যক্তিটিকে। তবু পৃথ্বী মুখ খোলেনি। বলে দেয়নি দুর্গাদাসের আস্তানার খবর। রুক্মিণীর দুই চোখ জলে টল্‌টল্ করে ওঠে। নিঃশব্দে, অতি সাবধানে সে ওড়না দিয়ে চোখ মুছে ফেলে বারবার। অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকে সে। এই সুন্দর মনের মানুষটিকে সে বলেছিল, বিশ্বাসঘাতক। নজের খুশীমত রুক্মিণী একবার কেঁদে নিতে চায়। করিমবক্সের কথাও সে শুনেছে সন্ন্যাসীর মুখে। করিমবক্স এখন শুধু একজন মুঘল সেনাপতি নয়, সে রুক্মিণীর কাছে হয়ে উঠেছে দেবতা।

আর ভুলুয়া? এই ভুলুয়াকে সে নিজের চোখে দেখেছে মাত্র একবার। এক চাঁদনী রাতে ভুলুয়া নিজের খেয়ালে পাহাড় ছেড়ে পৃথ্বীর পেছনে পেছনে ছুটে এসেছিল গ্রামে। রুক্মিণী ভয় পেয়েছিল তাকে দেখে। পৃথ্বীকে তিরস্কার করেছিল। আজ ভুলুয়া পৃথ্বীকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হয়ে পাহাড়ের জঙ্গলে যন্ত্রণা ভোগ করছে একা একা। তারও রুক্মিণী রয়েছে—পৃথ্বীর মুখে শুনেছে। কিন্তু সেই রুক্মিণী ভুলুয়ার জন্য কোল পেতে বসে নেই। তাকে নিয়ে আসতে বড় ইচ্ছা হয় রুক্মিণীর। পৃথ্বীর সঙ্গে তারও সেবা করে তাকে নিরাময় করে তুলতে সাধ হয়।

—রুক্মিণী!

—উঁ।

—আমি সেরে উঠেই দুর্গাদাসের কাছে চলে যাব।

—নিশ্চয় যাবে। তোমাকে তাঁর খুবই দরকার।

—কিন্তু কতদিনে ভাল হব? জান আমার হাতের হাড় দেখা যায়।

—জানি। সন্ন্যাসী বলেছেন খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবে।

উনি ওষুধ আনবেন কালকে। যারা তোমার ওপর অত্যাচার করেছে, তারা তোমার শিরা কাটতে পারেনি। সন্ন্যাসী বলছিলেন—তারা বোধহয় জানে না। কিংবা হয়ত পরে কাটত।

—না। ওরা আমাকে মেরে ফেলত। তাই বোধহয় কাটেনি।

—তাই হবে।

—মা কোথায় রুক্মিণী।

—ঘুমোচ্ছেন।

—মায়ের খুব কষ্ট হয়েছে, তাই নয়?

—হ্যাঁ। কিন্তু তার চেয়েও আনন্দ হয়েছে অনেক বেশী। আমি দেখেছি চোখে জল নিয়েও কী গর্বভরা হাসি হেসেছিলেন সন্ন্যাসীর মুখে সব শুনে।

—মায়ের আমার তুলনা হয় না।

—এবারে কিন্তু তোমাকে সত্যি সত্যি ঘুমোতে হবে।

—হ্যাঁ। তোমার গরুর দুধ কবে খেতে দেবে? বাচ্চা কবে হবে?

এত দুঃখেও রুক্মিণীর হাসি পায়। কোন্ কথার মধ্যে কোন্ কথা। একসঙ্গে সব কথা বলে ফেলতে চায় পৃথ্বী।

—আর একটাও কথা বললে গরু বেচে দেব।

—আচ্ছা। এবারে ঠিক ঘুমোবো। অমরটা খুব কাজের ছেলে। ওকে কালকে খবর দেবে তো?

—আমি নিজে গিয়ে বলে আসব। এবারে কিন্তু আমি মায়ের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়ব। দেখি কার সঙ্গে সারারাত ধরে বক্‌বক্ কর। এতটুকুও ক্লান্তি নেই।

একটু চুপ করে থেকে পৃথ্বী বলে—তোমাকে মাঝে মাঝে আমার ভয় করে।

রুক্মিণী জোরে হেসে ফেলে। সে বলে—তাই নাকি? প্রমাণ তো পাচ্ছি। এতক্ষণ ধরে ঘুমোতে বলছি, অথচ দিব্যি কথা বলে চলেছ।

– আচ্ছা, এইবার –

সন্ন্যাসীর ওষুধের গুণ আর পৃথ্বীর অসাধারণ জীবনীশক্তি তাকে একমাসের মধ্যে সুস্থ করে তুলল। তার ডান হাতের গভীর ক্ষতগুলি শুকিয়ে প্রায় ভরাট হয়ে গেল। তবে এই চিহ্ন আমৃত্যু সাথী হয়ে রইল।

সন্ন্যাসী বলেন – এতো অলঙ্কার। রুক্মিণীর হাতের রূপোর চূড় আর পৃথ্বীর হাতের ক্ষতচিহ্ন – দুই-ই এক।

পৃথ্বী লক্ষ্য করে রুক্মিণীর ছেলেমানুষী ভাব খুব তাড়াতাড়ি যেন তার স্বভাব থেকে বিদায় নিচ্ছে। ঠিক বিবাহিত কোন দায়িত্বশীলা বধূর মত। বেশ লাগে দেখতে। আবার আশঙ্কাও যে না হয়, তাও নয়।

সন্ন্যাসী চলে গিয়েছেন। আর মাত্র পনেরো-বিশ দিন সময় দিয়ে গিয়েছেন। তার পরেই পৃথ্বীকে চলে যেতে হবে। কারণ বাদশাহজাদা আকবর সুজাত ছেড়ে এগিয়ে আসছে। দুর্গাদাস দিন পনেরোর মধ্যে সৈন্যদল নিয়ে অগ্রসর হবেন। পৃথ্বী চঞ্চল হয়ে ওঠে। ওদিকে অমর সিং জেদ ধরেছে এবারে সে যুদ্ধে যাবেই। গাঁয়ের বোঝা আর সে বইতে পারবে না। সে যখন বিয়ে করবে, যখন তার ছেলে পেলে হবে তখন তাদের সামনে কোন্ মুখ নিয়ে দাঁড়াবে? কথাটা অন্যায় বলেনি সে। কিন্তু দুর্গাদাস বলেছেন, সংগ্রাম ক্ষেত্রে যুদ্ধ করতে যে বীরত্বের প্রয়োজন তার চেয়ে একটুও কম বীরত্ব নয় গ্রামের বোঝা বয়ে বেড়ানো। বরং এই বীরত্ব অনেক বেশী। এখানে উত্তেজনা নেই। অথচ এদের এক এক জন এক একশো সৈন্যের মনোবল জিইয়ে রেখেছে – যে মনোবল তাদের অস্ত্র চালনায় উদ্বুদ্ধ করে। পৃথ্বী জানে, কথাটা খুবই সত্য। তবু রাজপুত রক্তে এমন কিছু রয়েছে যা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে মানুষকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে।

রুক্মিণী লক্ষ্য করে দিন যত ঘনিয়ে আসছে পৃথ্বীর স্ফুর্তি যেন ততই বেড়ে চলেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। এতটুকুও কি আকৃষ্ট করতে পারে না সে পৃথ্বীকে? পৃথ্বীর আনন্দ হোক, বলার কিছু নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে কি এতটুকু বিষণ্ণতা প্রত্যাশা করতে পারে না সে? হয়ত রয়েছে মনে মনে। বাইরে প্রকাশ করে না পৃথ্বী।

রুক্মিণী শুনেছে এবারের যুদ্ধ বেশ প্রবল হবে বলে সবার ধারণা। পৃথ্বীর সঙ্গে সন্ন্যাসীর আলোচনায় তার আভাষ পাওয়া গিয়েছে। মনে মনে তার একটা দ্বিধা ছিল। সেই দ্বিধা কাটিয়ে সে একদিন দুপুরে পৃথ্বীর অনুপস্থিতিতে তার মায়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়।

—কে রুক্মিণী? পৃথ্বী এখনো ফিরল না তো? নিশ্চয় অমরকে নিয়ে কোথায় গিয়েছে।

—হ্যাঁ। ফিরতে একটু দেরি হবে।

পৃথ্বীর মা অবাক হয়। পৃথ্বী নেই জেনেও রুক্মিণী এসেছে।

—তোমার কোন দরকার আছে বুঝি?

—হ্যাঁ।

রুক্মিণী পৃথ্বীর মায়ের পাশে বসে পড়ে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছুতেই বলতে পারে না কেন এসেছে।

পৃথ্বীর মা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বলে—কি হল? কী দরকার বললে না তো? রুক্মিণী মুখ নীচু করে ওড়নার প্রান্ত দিয়ে আঙুল জড়াতে থাকে। পৃথ্বীর মা কিছুটা আভাষ পায়। রুক্মিণীর চিবুক তুলে ধরে সস্নেহে বলে—বলো মা। আমার কাছে সঙ্কোচের কি আছে?

—ও চলে যাবে।

—হ্যাঁ। তোমার মন খারাপ হয়েছে? আবার তো আসবে। রাজপুত মেয়েদের জীবনই তো এই। এবারে ফিরে এলে তোমাদের বিয়ে দিয়ে দেব। আর দেরি করব না। তোমার বাবাকে সেই কথাই বলে এসেছি।

রুক্মিণীর মুখ কে যেন চেপে ধরে রাখে। সে বলতে পারে না এখনি বিয়ে দিতে। সে বলতে পারে না রাজপুত বীরদের জীবন পদ্মপত্রে জল। পৃথ্বী যদি আর না ফেরে? রুক্মিণী তো অন্য কাউকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে না জীবনে। শৈশব থেকেই জেনে এসেছে পৃথ্বী তার স্বামী। তবে? এখন বিয়ে হলে সেই দিক থেকে নিষ্কৃতি পাবে। তাছাড়া পৃথ্বীর স্মৃতিও তার মধ্যে ধীরে ধীরে জীবন-রস পেয়ে পৃথিবীর আলোয় এসে যেতে পারে। এতে পৃথ্বীর মায়েরও তো সান্ত্বনা।

লজ্জার মাথা খেয়ে সে বলে ফেলল—ও এবার যাবার আগেই যদি আমাকে নিয়ে নিতেন।

পৃথ্বীর মা বিহ্বল হয়ে পড়ে। রুক্মিণীর মুখের দিকে বহুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর রুক্মিণীর মনোভাব তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। ঠিক। ঠিক। একথা তো ভাবেনি সে।

—হ্যাঁ। আমি বিয়ের ব্যবস্থা করছি। খুবই দরকার বিয়ের। এ বিয়েতে সমাবেশ হবে না। তবু এর চেয়ে উপযুক্ত সময়ে বিয়ে হয় না। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো মা।

রুক্মিণী পৃথ্বীর মায়ের বুকে মাথা গোঁজে।

তিনদিন পরে গভীর রাতে রুক্মিণীর পাশে শুয়ে পৃথ্বী বলে—এটা কেমন হল?

—কেমন আবার? বেশ হল।

—আমি জানতেই পারলাম না।

—তুমি আবার কি জানবে? তুমি যুদ্ধ করবে। বিয়ে করার করে ফেললে। তোমার তো কোন দায়িত্ব নেই।

—বাঃ, আমি না তোমার স্বামী? দায়িত্ব নেই মানে?

—কদিন পরে তো চলে যাচ্ছ। কত যেন দায়িত্ব।

—সেইজন্যই তো মায়ের মুখে শুনে বিয়ে করতে চাইনি। মা

কিছুতেই শুনল না। তোমার নিশ্চয় ইচ্ছে ছিল না?

—একটুও না।

—সেকথা বলতে পারলে না?

—কেন? তোমার খারাপ লাগছে বুঝি?

পৃথ্বী রুক্মিণীকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—ভীষণ খারাপ লাগছে।

—বুঝেছি।

—কী বুঝেছ?

—ভীষণ খারাপ লাগছে।

—এঁ্যা? তোমার খারাপ লাগছে?

—লাগছেই তো।

—যাঃ। সত্যি লাগছে?

—বললাম তো।

—আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে।

—আমাকে ছেড়ে দাও। তুমি এক একবার এক একরকম কথা বল।

—এবারে সত্যি কথা বলছি।

—ঠিক?

—ঠিক।

—তাহলে ছেড়ে না-ও দিতে পার।

—এবার তুমি বল।

—কি বলব?

—তোমার খারাপ লাগছে?

—তোমার কি মনে হয়?

—কি জানি। ঠিক বুঝতে পারিনা।

রুক্মিণীর সহসা সমস্ত ভালবাসাটুকু উজাড় করে দিতে ইচ্ছা হয় দুদিন পরেই কোথায় চলে যাবে তার পৃথ্বী।

সে বলে—তোমার কতটা ভাল লাগছে?

— অনেকটা — তুমি কল্পনাই করতে পারবে না।

— আমার তার চেয়েও অনেকগুণ বেশী ভাল লাগছে।

— ইস্।

— বিশ্বাস করলে না তো?

— করেছি।

— কেন করলে বিশ্বাস?

— বিশ্বাস করব কেন? অনুভব করলাম।

— বাঃ, এতক্ষণে লাখ কথার এক কথা বলেছ।

ওদের কথা কখন শেষ হয়েছিল আকাশের তারারা বললেও বলতে পারে। তবে তরুণ সূর্য তাদের অনেকক্ষণ ধরে নিদ্রিত দেখল পর পর কয়েকদিন।

•

মেবারের রাণা জয় সিংহ এবং দুর্গাদাসের ত্রিশহাজার সৈন্যের বলে বলীয়ান হয়ে আওরঙজেব-পুত্র আকবর সত্যিই একদিন আজমীঢ়ের দিকে অগ্রসর হল। কিছুদূর অগ্রসর হবার পর তার প্রধান সেনাপতি এবং উপদেষ্টা তাহেবর খাঁয়ের পরামর্শে এবং রাজপুতদের সম্মতিতে একখানা পত্র পাঠালো আজমীঢ়ে। পত্রটির বিষয়বস্তু হল, দুই রাজপুত-প্রধানের আকুল প্রার্থনায় সে তাদের উভয়কে পিতার নিকট নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। রাজপুতরা তাদের ভুল উপলব্ধি করেছে। বাদশাহের মার্জনা-প্রার্থী তারা।

পত্রটি প্রেরণ করে আজমীঢ়ের পথে সে-রাত্রে আকবরের শিবিরে স্ফুর্তির স্রোত বয়ে গেল। দূর থেকে দুর্গাদাস তাই লক্ষ্য করে পুত্র তেজ সিং এবং পৃথ্বী সিংকে ডেকে দেখিয়ে বলেন, বাদশাহজাদা মানুষটি ভাল হলেও ধূর্ত বলা যায় না। তাছাড়া ওই তো দেখছ ওর শিবিরের অবস্থা। শেষ পর্যন্ত আফশোষ করতে না হয়।

তেজ সিং বলে — ওঁকে সামলানো যায় না?

। না। ছেলেবেলা থেকে ওইভাবেই মানুষ হয়ে উঠেছে। এখন এটা ওর জীবনে অপরিহার্য। অবশ্য এর মধ্যেও আওরঙজেবের মত সংযত পুরুষও দেখা দেয়। আবার স্ফূর্তির মধ্যেও কর্তব্যকর্মে অবিচল মুঘল-বাদশাহ ছিলেন অনেকে।

পৃথ্বী বলে – ওর পত্র পেয়ে বাদশাহ কি বিশ্বাস করবেন ?

– বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনটাই করবেন না। সব কিছুই তিনি নিজে যাচাই করেন। তিনি এখন শুধু অপেক্ষা করবেন।

আজমীঢ়ের আরও নিকটে পৌঁছে আকবর তার মুখোশ খুলে ফেলে। কয়েকজন মুসলমান মৌলবীর মত নিয়ে সে বাদশাহকে চরম পত্র পাঠায়। তাতে লেখে যে আওরঙজেব পবিত্র কোরাণের অনেক বিধি-নিষেধ অমান্য করেছেন। তাঁর আর দিল্লীর তখ্‌ত্‌তাউসে বসার নৈতিক কোন অধিকার নেই। তাই আকবর নিজেকে হিন্দুস্থানের বাদশাহ বলে ঘোষণা করল।

দুর্গাদাস এই ঘোষণার কথা শুনে আকবরের সঙ্গে দেখা করে বলেন – আপনি আর একটুও সময় নষ্ট করবেন না। আপনার তরফ থেকে যতটুকু দেরি হবে বাদশাহের ততটুকুই লাভ।

আকবর চেঁচিয়ে ওঠে – কে বাদশাহ ? আপনি আমার ঘোষণা শোনেননি ?

দুর্গাদাস সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেন – আমার ভুল হয়েছে। বহুদিনের অভ্যাসে মুখ ফসকে বার হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের আর অপেক্ষা করার সময় নেই জাঁহাপনা।

আকবর হেসে বলে – আপনি খবর রাখেন না। আজমীঢ়ে এখন মুষ্টিমেয় কিছু সেনা রয়েছে মাত্র। আওরঙজেব সম্পূর্ণ অরক্ষিত।

– কিন্তু আপনার ঘোষণা শুনে মোয়াজ্জেম এবং অন্যান্য সেনাপতিরা দ্রুত এগিয়ে আসবে তাঁকে সাহায্য করার জন্য।

– শুনুন রাঠোর-বীর। যুদ্ধকৌশল আমারও জানা আছে।

আপনি অনর্থক ব্যস্ত হবেন না।

হতাশ দুর্গাদাস ফিরে যান।

ওদিকে বাদশাহ আওরঙজেবের শিবিরে সত্যই মুহ্যমান অবস্থা। আজমীঢ় ছেড়ে বাদশাহ পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে এগিয়ে গিয়ে দোহারায় শিবির স্থাপন করেছেন। সবচেয়ে প্রিয় পুত্র আকবরের এই বিশ্বাস-ঘাতকতায় তিনি অস্ফুট স্বরে শুধু বললেন – আমি একেবারে অসহায়। ওই অর্বাচীন বীর পুঙ্গব সত্যিই এক অপূর্ব সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু সে বিলম্ব করছে কেন? এখনো তো আমাকে আক্রমণ করল না? খুবই তাজ্জব ব্যাপার।

বাদশাহের পাশে যারা উপস্থিত ছিল তাদের মুখে কোন ভাষা নেই। বহু যুদ্ধের নায়ক বৃদ্ধ বাদশাহ নিজের অসহায়ত্বের কথা জেনেও আকবরের এই বিলম্বে যুদ্ধবিশারদ হিসাবে অস্বস্তি অনুভব করেন। তিনি আকবর হলে এ অবস্থায় এক মুহূর্তও দেরি করতেন না! বাদশাহ হবার এমন সুযোগ মুঘল বংশের কোন বাদশাহজাদার জীবনে আসেনি।

নিজ পুত্রের দুর্বলতার কথা অনুভব করে সেই মুহূর্তে আওরঙজেব তাঁর যুদ্ধ-কৌশল ঠিক করে ফেলেন। পাশে দণ্ডায়মান এনায়েৎ খাঁ। আকবরের মুখ্য পরামর্শদাতা ও প্রধানমন্ত্রী তাহেবর খাঁ এনায়েৎ খাঁয়ের জামাতা।

বাদশাহ এনায়েৎ খাঁকে বলেন – তাহেবরকে এখুনি পত্র লেখ। সে যদি এখনো এসে আমার সঙ্গে দেখা করে তাহলে ক্ষমা করব। নইলে তার স্ত্রী পুত্র কন্যা, যারা তোমার কাছে রয়েছে তাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হবে।

বৃদ্ধ এনায়েৎ শিবির ছাড়ার উপক্রম করলে বাদশাহ বলেন – শোন, পত্রটি যেন আর কারও হাতে না পড়ে।

বাদশাহ কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হন। তারপর নিজে স্বহস্তে একটি পত্র লিখতে শুরু করেন পুত্র আকবরকে।

তুমি যে অপূর্ব কৌশল দেখিয়েছ তাতে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তোমার প্রতি আমার যেটুকু বিরূপতা ছিল তা নিঃশেষে ধুয়ে মুছে গিয়েছে। মেবার ও রাঠোরদের মিলিত সেনাবাহিনী এবং তাদের দাম্ভিক রাণা এবং সেনাপতিদের পর্যুদস্ত করতে তোমার তুলনা নেই। আমি দু'একদিনের মধ্যেই তোমার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের ধ্বংস করব।

পত্রখানিতে নিজের পাঞ্জার ছাপ দিয়ে তিনি বলেন—করিমবক্স কোথায়?

একটু পরেই করিমবক্স এসে উপস্থিত হয়। বাদশাহ তার চোখের দিকে সোজা দৃষ্টি ফেলে বলেন—তোমাকে আগের মত আর বিশ্বাস করি না। বিশ্বাসের ভিত টলে গিয়েছে।

করিমবক্স কেঁপে ওঠে। সে বলে—আমি সজ্ঞানে অবিশ্বাসের কোন কাজ করিনি।

—সেটা তুমিই ভাল বলতে পার। আমিও এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট প্রমাণ কিছু পাইনি। তবে খবর আছে এক রাজপুতের মুক্তিতে এবং আয়ুব খাঁয়ের অন্তর্ধানে তোমার হাত থাকতে পারে।

—জাঁহাপনা।

—না। শাস্তি আমি তোমাকে দিতে পারছি না এই মুহূর্তে। আমি আরও স্পষ্ট প্রমাণের অপেক্ষায় আছি।

করিমবক্স তার মুখের রেখাকে অবিকৃত রাখলেও মনে মনে বিস্মিত না হয়ে পারে না। সে বলে—আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে বিশ্বাস-যোগ্য কোন কাজ দিয়ে পরীক্ষা করুন।

—হ্যাঁ। তাই তোমাকে ডেকেছি। এই পত্রখানি আমি আকবরকে লিখেছি। এটি নিয়ে তুমি আকবরের শিবিরের দিকে রওনা হবে। কিন্তু ধরা পড়তে হবে তোমাকে রাজপুতদের কাছে যাতে পত্রটি তাদের হাতে পড়ে।

—আমি এখুনি রওনা হচ্ছি।

— না। এখন নয়। আজ শেষ রাতে। তার আগে এখানে গভীর রাতে আসবে বিশ্বাসঘাতক তাহেবর খাঁ। তাকে অভ্যর্থনার জন্য একটু ব্যবস্থা করেছি। তুমিও বুঝতে পারবে বিশ্বাসঘাতককে কিভাবে অভ্যর্থনা করা হয়। চিঠিখানা রাজপুতদের হাতে যাওয়া চাই। তুমি যদি ওদের হাতে ধরা পড়েও পালাতে পারো তাতে আমার আপত্তি নেই।

করিমবক্স অভিবাদন জানিয়ে শিবির ছাড়ে। অপমানে বেদনায় তার মন ভরে ওঠে। সে বুঝতে পারে, বাদশাহ এখন তাকে অনভিপ্রেত বলে ভাবেন। নইলে এই বিপদের মুখে তাকে পাঠাতেন না। বাদশাহ নিশ্চয় তার পেছনে চর লাগিয়েছেন। জীবনের ওপর কোনদিনই তার বড় একটা আকর্ষণ নেই। তার মা এবং ফতেমা তার জীবনের স্বপ্ন দেখাকে চূরমার করে দিয়েছে। সে শুধু চেয়েছিল সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে। তাও হলোনা। তাকে এবার থেকে অপমানিতের জীবন যাপন করতে হবে। সবাই তার দিকে আঙুল তুলে ফিস্‌ফিস্‌ করবে। আর যদি ধরা পড়ে যায়, তবে তো চুকেই গেল সব।

তাহেবর খাঁ এনায়েৎ খাঁয়ের চিঠি পেয়ে রীতিমত বিচলিত বোধ করল। আকবরের ঢিলেমী দেখে ইতিমধ্যেই তার উচ্চাশার ফানুস একটু একটু করে চুপসে যাচ্ছিল। চিঠিখানা সেটিকে একেবারে চুপসে দিল। অস্থির হয়ে সে কিছুক্ষণ পায়চারী করল। তারপর রাত গভীর হলে গোপনে শিবির ত্যাগ করে দোহারার দিকে রওনা হল একা।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সে বাদশাহের শিবিরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। অশ্বটিকে শিবিরের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে সে শিবিরে প্রবেশের জন্য এগিয়ে যায়।

বাদশাহের দেহরক্ষী তাকে বাধা দেয়।

—পথ ছাড়ো। আমাকে চিনতে পারছ না? আমি তাহেবর খাঁ। বাদশাহ নিজে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

শিবিরের ভেতর থেকে বাদশাহ চেঁচিয়ে ওঠেন।—হ্যাঁ, ও আমার কাছে এসেছে। ওকে ভালভাবে আদর আপ্যায়ণ কর।

ইঙ্গিত বুঝে দেহরক্ষীরা তাহেবরকে আক্রমণ করে। আকস্মিক আক্রমণে সমস্ত ব্যাপার বুঝে নিয়ে সে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু শিবিরের দড়িতে পা আঁটকে পড়ে যায় হুমড়ি খেয়ে। দেহরক্ষীদের অসি তার মস্তককে দেহচ্যুত করে।

আকবরের শিবিরে তাহেবরের কথা সবাই যেন কীভাবে জেনে যায়। সম্ভবত বাদশাহই সেই বন্দোবস্ত করেছিলেন। সেই রাত্রেই সৈন্যরা দলে দলে দোহারার দিকে রওনা হয়। তারা বুঝে ফেলে যে-মানুষ স্ফূর্তি আর বিলাসিতা ছাড়া কিছু বোঝে না, তার হ'য়ে বাদশাহের বিরুদ্ধে লড়া আদৌ নিরাপদ নয়।

এদিকে কৌশলী করিমবক্স রাজপুত শিবিরের কাছে এসে যায়। সে এমন ভাব দেখায় যেন সে আকবরের দলের লোক। ভয় ছিল তার পৃথ্বী কিংবা তেজ সিং দেখে ফেললে সে ধরা পড়ে যাবে! কিন্তু তারা সম্ভবত অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল। সে ধরা দেয় একজন মেবার-সেনার কাছে। বলে, কোন এক অচেনা সেনার কাছে চিঠিখানা পায়। আওরঙজেবের পাঞ্জাব ছাপ দেখে আকবরের শিবিরের দিকে যেতে সাহস না পেয়ে রাজপুতদের কাছে নিয়ে এসেছে।

চিঠিখানাকে ঘিরে রাজপুত মহলে যখন প্রবল আলোড়ন, তখন সুযোগ বুঝে করিমবক্স ঘোড়া নিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়।

পরদিন সূর্য ওঠার কিছু পরে আকবরের বেগম তার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।

বিরক্ত আকবর বলে ওঠে—এখন কত বেলা?

—বেলা বেশী হয় নি।

চিৎকার করে আকবর বলে—তাহলে ঘুম ভাঙালে কেন?

শান্ত বিষণ্ণ বেগম বলে—একবার বাইরে গিয়ে দেখে এসো। আমি, তোমার দুই ছেলে, একটি মেয়ে আর শ'পাঁচেক লোক ছাড়া আর কেউ নেই। সব ফাঁকা হয়ে গিয়েছে।

—তার মানে?

—সব পালিয়েছে।

—সে কি? আমার সৈন্য?

—নিশ্চয় আজমীঢ়ের দিকে গিয়েছে। তোমার ওপর ভরসা রাখতে পারে নি।

—তাহেবর খাঁ?

—সে নেই।

—নেই? রাজপুতরা?

—তারাও মিলিয়ে গিয়েছে।

মুহূর্তে আকবর সমস্ত পরিস্থিতি যাচাই করে নেয়। সে বুঝতে পারে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র হয়েছে। আর এই ষড়যন্ত্রের মূলে কার মগজ কাজ করেছে সেটাও অনুমান করতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। নইলে এমন নিখুঁতভাবে তাকে অসহায় করে তুলতে আর কেউ পারত না। তারই গাফিলতিতে বাদশাহ এই সুযোগ পেয়ে গেলেন। সে সময়ের অপচয় করেছে। কিন্তু সে ধরা দিতে পারে না। ধরা দিলে একটিই পরিণতি। স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে ফেলে রেখে মাড়োয়ারের দিকে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। ওরা কেউ তাকে আশ্রয় দিতে না চাইলেও একেবারে প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।

দুই নাবালক পুত্র পিতার হাবভাব দেখে সামনে এসে বলে—আমাদের তুমি সঙ্গে নিয়ে যাবে না?

—কি করে নেব? তোমাদের প্রাণের ভয় নেই। কিন্তু আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত। তাই আমি চলে যাচ্ছি।

অত অল্প বয়েস। তবু পিতার উক্তিতে ঘৃণায় বিকৃত হয় তাদের মুখ।

সেই সময় দূরে দেখা যায় মাড়োয়ারের দিক থেকে একদল অশ্বারোহী ছুটে আসছে। ওরা কি তাকে হত্যা করতে আসছে? সে দলের অবশিষ্ট লোকদের প্রস্তুত হতে বলে।

বলে—আমি আজ পরিত্যক্ত। তোমরা আমার অতি বিশ্বস্ত বলে আমাকে ছেড়ে যাওনি। তোমাদের এই ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না। তাই আমার শেষ অনুরোধ রাজপুতরা যদি আক্রমণ করে, তোমরা প্রতিরোধ কর।

কিন্তু রাজপুতরা আক্রমণ করে না। তাদের দলনায়ক পৃথ্বী সিং এগিয়ে এসে অভিবাদন জানিয়ে বলে, মেবারের রাণা এবং দুর্গাদাস উভয়েই বুঝতে পেরেছেন যে আকবর কোন চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। তাই তারা এসেছে তাঁকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে।

হতাশার মধ্যেও আকবরের চোখ দুটো আশার আলোয় চিক্‌চিক্ করে ওঠে। সে পুত্রদের বলে—তোমরা আমার সঙ্গেই যাবে।

পৃথ্বী বলে—মাড়োয়ার কিংবা মেবারে আপনাকে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব না হলে, মারাঠায় শম্ভূজীর কাছে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

—শম্ভুজী? তিনি আশ্রয় দেবেন?

—দুর্গাদাস বলেছেন, ‘তিনি অনুরোধ করলে শম্ভূজী না করতে পারবেন না।

আকবর পাঁচশো অনুচর নিয়ে খুব সত্বর পৃথ্বীর দলের সঙ্গে রওনা হয়। এই ক্ষিপ্রতা দুদিন আগে দেখাতে পারলে হিন্দুস্থানের ইতিহাস অন্য ভাবে লেখা হতে পারত।

রুক্মিণীর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হল না পৃথ্বীর। বাদশাহজাদা আকবর মারাঠা রাজদরবারের দিকে রওনা হয়ে গেল খান্দেশের ভেতর দিয়ে। তাকে হত্যা করার জন্য প্রেরিত ছোট-বড় অনেক মুঘল দলের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হল দুর্গাদাসকে। বাদশাহ তাঁর

বিদ্রোহী পুত্রকে না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে মেবার আর মাড়োয়ারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য মুঘল বাহিনীকে দুই পথে পরিচালিত করলেন।

এই সম্ভাব্য আক্রমণের কথা দুর্গাদাস আগে থাকতেই অনুমান করেছিলেন। তিনি মাড়োয়ারের সেনাবাহিনীকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে মাড়োয়ারের পাহাড়ে পর্বতে মরুপ্রান্তরে ছড়িয়ে রাখলেন। এই দলগুলোর সঙ্গে সংযোগ রক্ষার ভার পড়ল পৃথ্বী আর তেজ সিং-এর ওপর। খুবই দুরূহ কাজ। অধিকাংশ সময়েই সাধারণ রাজপুতের বেশে তাদের চলাফেরা করতে হয়। মুঘলরা এতটুকু সন্দেহ করলে তাদের মৃত্যু অবধারিত। কারণ অনেক সময় মুঘলবাহিনীর সামনে দিয়েও তাদের যাতায়াত করতে হয়। পৃথ্বী জানে, আয়ুব খাঁ বেঁচে থাকলে এত নিশ্চিন্তে সে এভাবে ঘোরাফেরা করতে পারত না। লোকটা ছিল অসাধারণ ধূর্ত। কিন্তু আয়ুব না থাকলেও তাব দলবল রয়েছে। তাদের কেউ না কেউ আয়ুবের অসাধারণ দৃষ্টি নিয়ে পৃথ্বীকে চিনে রাখতে পারে।

মাড়োয়ারে মুঘল সেনারা কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় না। শুধু রাতের অন্ধকারে কিছু কিছু সংঘর্ষে তাদের ক্ষতি হয়। সেই ক্ষতির পরিমাণ এক এক সময় তাদের বেসামাল করে ফেলে। ফলে যোধপুরের পথে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে তারা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়। নারী শিশু বৃদ্ধ, যাদের পায় হত্যা করে—অত্যাচার করে।

ক্লান্ত পৃথ্বা এক সন্ধ্যার প্রাক্কালে জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের এক গাছের নীচে বিশ্রাম নিচ্ছিল। তার পাশে তেজ সিং নিদ্রিত। এটি তাদের গুপ্ত স্থানের একটি। সেই সময় পৃথ্বী দেখতে পায় নীচে থেকে একজন অশ্বারোহী পাহাড়ে উঠছে। একাকী কোন অশ্বারোহীর পক্ষে এই সময় এভাবে পর্বতে ওঠা মোটেই স্বাভাবিক নয়। তাই অনিচ্ছা সত্বেও তেজ সিংকে ডেকে তোলে সে!

অশ্বারোহী এগিয়ে আসতে থাকে।

তেজ সিং বলে — নিশ্চয় আমাদের কেউ।

—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। একজন মুঘল কখনো একা এভাবে মাড়োয়ারের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে না। কিন্তু লোকটা আমাদের দিকেই আসছে যেন। আমাদের এই জায়গার কথা দুর্গাদাস জানেন। তিনিই পাঠিয়েছেন কি?

— হতে পারে। কোন খবর আছে বোধহয়।

— দেখা যাক।

অশ্বারোহী ওপরে উঠে আরও এগিয়ে এসে চেঁচিয়ে ডাকে — তেজ সিং।

দুজনেই একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে অশ্বারোহীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কাছে এসে অশ্বারোহী ঘোড়া থেকে নামে। বলে — দুর্গাদাস পাঠালেন।

— হঠাৎ? তেজ সিং প্রশ্ন করে।

— পৃথ্বী সিংকে ফিরে যেতে হবে।

অসন্তুষ্ট তেজ সিং বলে — কেন?

— পৃথ্বী সিংকে গ্রামে ফিরতে হবে। মুঘলরা গ্রামখানা একেবারে পুড়িয়ে দিয়েছে।

পৃথ্বীর বুক কেঁপে ওঠে। মা? রুক্মিণী? তারা কেমন আছে?

তেজ সিং বিচলিত হয়ে বলে — পৃথ্বীর বাড়ির খবর কি?

— কেউ জানে না। তবে বাড়িতে কাউকে দেখা যায় নি। ঘর পুড়েছে।

— কবে এমন হল?

— পরশু। পরশু রাতে।

পৃথ্বী সিং তেজ সিং-এর কাঁধে হাত রেখে বলে — চলি ভাই। আমি ফিরে আসব। ওদের পেলেও আসব, না পেলেও —

আজও নন্দিনী তার সাথী। অযত্নে অবহেলায় তার চাকচিক্য ততটা নেই। কিন্তু এখনো শক্তিহীন নয় সে। পৃথ্বীর সহসা মনে হয়,

পৃথিবীতে রূপ রস গন্ধ বলে কিছুই অবশিষ্ট নেই। বুকের ভেতরটা ফাঁকা – মরুভূমিতে যেন ধূলোর ঝড় উঠেছে। এতটুকুও জলীয় বাষ্প নেই সেই ঝড়ে। তার শুকনো চোখ দুটো জ্বলছে। তার বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে।

– যত জোরে পারিস ছুটে চল নন্দিনী। হয়ত আর কখনো তোকে কোন অনুরোধ করব না। হয়ত তুই এর পর সঙ্গীহীন হবি। শুধু দেখতে চাই রুক্মিণী আর মা বেঁচে আছে কি না।

পৃথ্বীর আশংকা হয় মুঘলরা যদি রুক্মিণীকে ধরে নিয়ে যায়? যদি অত্যাচার করে তার ওপর? হে ঈশ্বর! তার চেয়ে ওকে যেন হত্যা করে রেখে যায়। নইলে ওকে আত্মহত্যা করতে হবে।

প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত হয়। গাঢ় অন্ধকার রাত্রে নন্দিণী পৃথ্বীকে নিয়ে চলে তার গ্রামের পথে। কোথাও এতটুকু আলো নেই। পৃথ্বীর মনও অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

বিয়ের পর রুক্মিণীর সঙ্গে কয়েকদিন ঘর করার প্রতিটি মুহূর্ত তার মনের মধ্যে উঁকি দিতে থাকে।

পরদিন মধ্যাহ্নে সে গ্রামের প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়। তার চোখে হতাশা ফুটে ওঠে। একখানা আস্ত কুটিরও কোথাও নজরে পড়ল না। নানান্ দিক থেকে তখনো অল্প অল্প ধোঁয়া উঠে আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সে পাগলের মত নন্দিনীকে নিয়ে ছুটতে থাকে। ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ায় সেই শিমূল তলায়। রুক্মিণীর বাপের বাড়ি। কোথায় বাড়ি? কিছুটা পোড়া কাঠ পড়ে রয়েছে। আর ওই যে গোয়াল ঘর। রুক্মিণীর সাধের গরু পুড়ে মরে পড়ে রয়েছে। কত সাধ ছিল রুক্মিণীর এই গরুর দুধ খাওয়াবে তাকে।

ছুটে যায় সে নিজের বাড়িতে। ধোঁয়া বার হচ্ছে তখনো। যে-ঘরে সে রুক্মিণীর সঙ্গে রাত কাটিয়েছে সেই ঘরের কোন অস্তিত্ব নেই। মায়ের ঘরটি আধ-পোড়া অবস্থায় খাড়া রয়েছে কোন রকমে।

— মা ! মাগো ! চিৎকার করে ওঠে পৃথ্বী।

— মা, আমি পৃথ্বী। সাড়া দাও মা।

কোন জবাব নেই।

ছুটে সেই ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে সে। ভেবেছিল এখানে তার মায়ের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখবে। কিন্তু কোথায় ?

— রুক্মিণী ! আমি ফিরে এসেছি। তুমি কোথায় ?

পৃথ্বীর বুকের ভেতরে কিসের এক প্রবল আলোড়ন। সে কাঁদতে চায় — পারে না।

— রুক্মিণী ! উন্মাদের মত চিৎকার করে ওঠে পৃথ্বী।

তার সেই চিৎকার প্রতিধ্বনিত হবার মত একটা দেওয়ালও অবশিষ্ট নেই।

ছুটে বার হয়ে যায় পৃথ্বী। চারদিকের ঝোপ-জঙ্গল তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ায়। কোথায় গেল ? মৃতদেহও তো থাকবে ? তবে কি ওরা আগে থেকে জানতে পেরে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে ? হে ভগবান ! তাই যেন হয়। অমর গেল কোথায় ? একমাত্র পুরুষ অভিভাবক অমর সিং ? সে কি গ্রামের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলে গিয়েছে কোন নিরাপদ স্থানে ? সে কি রুক্মিণী আর মাকেও নিয়ে যেতে পেরেছে ?

সব কিছু খুঁজে নিরাশ হয়ে দগ্ধ কুটিরের দাওয়ায় বসে থাকে সে। এবার কি করবে ? কি করা উচিত ? এখন ব্যক্তিগত কারণে দুর্গাদাসের কাছে গিয়ে তাঁকে বিরক্ত করতে পারে না সে। তিনি খুবই ব্যস্ত। তবে ?

মধ্যাহ্ন গড়িয়ে বিকেল হয়। তারপর একসময়ে সন্ধ্যা হতে চলে। পৃথ্বী বসেই থাকে। তার সব উদ্যম নিঃশেষিত ! পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কত তীব্র অকাঙ্ক্ষাই না ছিল তার দুদিন আগেও। অথচ আজ বিন্দু মাত্রও নেই। এখন তার জীবনে শুধু দিন যাবে রাত আসবে, রাত যাবে দিন আসবে। তবু সে বাঁচবে। সে কাপুরুষ

নয়। কিন্তু বাঁচতে হবে বড় বেশী কর্মব্যস্ততার মধ্যে। মা বৃদ্ধা হয়েছিল বটে, কিন্তু তার মৃত্যু তো স্বাভাবিক নয়। আর রুক্মিণী? তাকে কীভাবে বিস্মৃত হবে? দুর্গাদাসের কাছে গিয়ে সে এমন কোন কাজ প্রার্থনা করে নেবে যাতে মুহূর্তের জন্যও বিশ্রাম না মেলে তার। দুর্গাদাস বিজ্ঞ— নিশ্চয় বুঝবেন।

আশ্চর্য! রুক্মিণী নেই, তবু একফালি চাঁদ দেখা দিয়েছে পশ্চিমের আকাশে। একটু পরেই ডুবে যাবে। রুক্মিণীও ওই দ্বিতীয়ার চাঁদের মত। উদয় না হতেই অস্তমিত হয়ে গেল। আকাশে কত তারকা! ওই সব তারার কতরকমের অর্থ ছিল তার কাছে দুদিন আগেও। এখন নিরর্থক। ওরা থাকুক বা না থাকুক কিছুই এসে যায় না। রুক্মিণীহীন জীবনে ওদের অস্তিত্বের কানাকড়ি মূল্যও নেই।

রাত আরও গভীর হয়। পৃথ্বী ঠায় বসে থাকে একইভাবে। দূরে শিয়াল ডাকে। গ্রামের কুকুর গুলোও কোথায় চলে গিয়েছে যেন। পৃথ্বীর দেহ-মন দুঃখ বেদনা ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব কিছুর উর্ধ্বে যেন। সে প্রথমে ছিল কাতর, এখন পাথর।

রাতের প্রহর কাটে। প্রহরে প্রহরে শিয়াল ডাকে। শেষ প্রহরেও শিয়াল ডেকে ওঠে একবার। তার মানে আর একটি দিন এগিয়ে আসছে, যেখানে রুক্মিণী নেই। এই সময় মুহূর্তের জন্য তিনদিনের ক্লান্ত ক্ষুধার্ত পৃথ্বীর চোখ আপনা হতে বন্ধ হয়ে যায়।

খুব বেশীক্ষণ নয়। হয়ত সামান্য কয়েক পলকের মত! হঠাৎ একটা শব্দে চোখ মেলে পৃথ্বী। চেয়ে দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক ছায়ামূর্তি যেন।

— কে? অমর? ওরা কোথায়?

— আমি করিমবক্স পৃথ্বী।

ঠিক এই সময় কে যেন করিমবক্সকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে। হাতের ছোরা বিঁধিয়ে দেয় পৃষ্ঠদেশে। তারপর পাগলের মত হেসে ওঠে হা হা করে।

চিৎকার করে বলে—দুশমন। আর একটা দুশমনকে খতম করলাম।

পৃথ্বী বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখে জীর্ণ মলিন-বেশী অমর সিং রক্তাক্ত হাত আকাশের দিকে তুলে সমানে হেসে চলেছে।

পৃথ্বী উঠে দাঁড়িয়ে বলে—একি করলি অমর! কাকে মারলি তুই?

—দুশমন। গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করেছে। সবাইকে হত্যা করেছে।

পৃথ্বী তাড়াতাড়ি বসে পড়ে করিমবক্সের দেহখানা নিজের বুকের কাছাকাছি তুলে নেয়। উষার আলো একটু একটু করে ফুটতে শুরু করেছে।

করিমবক্সের মুখের কাছে মুখ এনে সে ভগ্ন কণ্ঠে বলে—দোস্ত, কেন এলে মরতে এখানে। আমি তোমাকে ডাকিনি।

রক্তশূন্য মুখেও হাসি ফুটে ওঠে করিমবক্সের। অতিকষ্টে নিম্নস্বরে বলে—ক্ষতি নেই। বাদশাহ আমাকে মেরে ফেলতেন। তিনি প্রমাণ পেয়ে গিয়েছেন, তোমাকে আমি মুক্ত করে দিয়েছিলাম।

—তাই বলে, এখানে এসে মরলে?

—হ্যাঁ, মুঘলরা গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে হত্যা করে, ধর্ষণ করে এগিয়ে আসছিল। আমিও তখন পালিয়ে এদিকেই আসছিলাম। ইচ্ছে ছিল দেশের অন্য কোন নবাব কিংবা রাজার অধীনে চাকরী নেব। তোমার গ্রাম আমি চিনি—পাহাড়টা দেখে চেনা যায়। দেখলাম মুঘলরা তোমার গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে। আগে ছুটে এসে গ্রামের লোকদের বললাম, শিগগির আমার সঙ্গে চল। মুঘলরা এখনি আসবে। ওরা কেউ বিশ্বাস করল না। আমি তখন বললাম, আমি মুঘল হলেও, পৃথ্বী সিং আমার দোস্ত। একটি খুব সুন্দরী বউ এগিয়ে এসে বলল, 'হ্যাঁ, ওঁর সঙ্গে আমরা যেতে পারি। উনি দেবতা।' মেয়েটা ওকথা বলল কেন জানি না। কিন্তু ওর কথা শুনে সবাই আমার সঙ্গে গেল। আমি লুকিয়ে রেখেছি।

এতগুলো কথা বলে করিমবক্সের বুক বড় বেশী ওঠা-নামা করতে শুরু করল। তার শ্বাসকার্য বিঘ্নিত হতে লাগল। অমর সিং উত্তেজনায় বশে হৃদপিণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করে দিতে পারেনি।

—লুকিয়ে রেখেছ!

—হ্যাঁ, পৃথ্বী। মুঘলরা বুঝতে পারে নি।

পৃথ্বী চেঁচিয়ে ওঠে—অমর, এ কি করলি তুই ?

অমর চেঁচিয়ে বলে—একজন মুঘলকে নিয়ে এসব কি হচ্ছে পৃথ্বী ? ফেলে দে ওকে। তোর বুক রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

—অমর তুই একে মারতে চেয়েছিলি একদিন। তোর মনস্কামনা পূর্ণ হল।

—হ্যাঁ। ঠিক হয়েছে। আরও দুশমন মারব।

করিমবক্স ফিস্‌ফিস্ করে বলে—ওই পাহাড়—ঝরণা রয়েছে। সেখানে তারা আছে। মেয়েটি বলল, জায়গাটা তোমার প্রিয়। সে-ই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।

পৃথ্বীর চোখ বেয়ে টপ্‌টপ্ করে দুফোঁটা জল করিমবক্সের কপালের ওপর ঝরে পড়ে।

সে বলে—মেয়েটি আমার স্ত্রী করিমবক্স। সে তোমাকে সত্যিই দেবতা বলে ভাবে।

—তোমার স্ত্রী ? খুব সুন্দর। শুভেচ্ছা—

করিমবক্সের মাথা হেলে পড়ে।

—একি করলি অমর সিং।

—আমি পাহাড়ে গিয়েছিলাম, সেই সময় এরা এসে গ্রাম পুড়িয়ে সবাইকে হত্যা করে রেখে চলে গেল। আর তুই বলছিস, কি করলাম।

—যারা মরল, তাদের মৃতদেহগুলো কোথায় গেল একবার ভেবে দেখলি না ?

—নিশ্চয় নিয়ে গিয়েছে তাহলে! বিক্রি করবে—অত্যাচার করবে।

—না—না অমর, ়া নয়।

পৃথ্বী করিমবক্সের দেহ আরও জোরে চেপে ধরে বুকের ভেতরে। অমর সিং অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সেই দিকে।

শেষে পৃথ্বী নিজেকে শান্ত করে। ধীরে ধীরে শুইয়ে দেয় বন্ধুর দেহ। অমর সিং-এর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে—পৃথিবীতে তুই আমাকে সবচাইতে বড় সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছিস অমর সিং।

—বড় সম্পদ? কী বলছিস?

—হ্যাঁ, এই যে করিমবক্স, যাকে গাঁয়ে লুকিয়ে রেখেছিলাম। ও আমার সবচাইতে বড় বন্ধু।

—বড় বন্ধু? আমি কিছুই না? শেষে মুঘল হল তোর বড় বন্ধু।

—চুপ কর অমর। মুঘল। মুঘলরা মানুষ নয়? মানুষ শুধু রাজপুত? মুঘলদের মধ্যে প্রেম প্রীতি ভালবাসা নেই? ভালবাসা বুঝি রাজপুতদের একচেটিয়া? কি করে বুঝবি তুই।

—কী জানি বাবা। এই দুদিনে ঘুরে ঘুরে পাঁচজন মুঘলকে হত্যা করেছি। গ্রামের দায়িত্ব আমার ওপর।

চিৎকার করে পৃথ্বী বলে—তাহলে গ্রামকে বাঁচাতে পারলি না কেন? কেন গ্রামবাসীদের রক্ষা করতে পারলি না?

—বাঃ, আমি তখন তো শিকারে গিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ। তুই শিকারে গিয়েছিলি বনে। আর যাকে তুই কাপুরুষের মত পেছন থেকে ছুরি মেরে হত্যা করলি সে এসে সবাইকে বাঁচালো।

—বাঁচালো? তুই কি পাগল হয়ে গেলি পৃথ্বী।

—চুপ কর মুর্খ। শুধু গ্রামবাসীদের নয় এই মুঘল একদিন ়াকেও বাঁচিয়েছিল।

অমর সিং এত কড়া কথা কোনদিন শোনেনি পৃথ্বীর মুখে। সে ়র দাঁড়িয়ে থাকে।

় সিং করিমবক্সের মৃতদেহ ধীরে ধীরে তুলে ধরে বয়ে নিয়ে

নন্দিনীর পিঠের ওপর শুইয়ে দিয়ে বলে—নন্দিনী! আজ তোর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মানের দিন। আজ আমার দেখা পৃথিবীর সবচেয়ে মহান ব্যক্তিটির শবদেহ তুই বহন করছিস। বিরস্ত অবস্থায় এঁকে একদিন তুই-ই বয়ে নিয়ে এসেছিলি আমাদের গ্রাম। চল্ নন্দিনী, বহ্নির কাছে চল্। সেখানে আমার বন্ধুকে চির-সমাহিত করব। ওর চেয়ে পবিত্র স্থান আমার আর জানা নেই। চল্ নন্দিনী, বন্ধুর আমার আরও অনেক চোখের জল পাওনা রয়েছে। অশ্রুজলে সবাই ওর দেহ ধুয়ে দেবার জন্য কিছু না জেনেও প্রশংসা করছে।

নন্দিনীর লাগাম ধরে পৃথ্বী স্তব্ধ অমর সিং-এর দিকে চায়। কেমন হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে ওই সরল মানুষটি। সমবেদনায় ভরে ওঠে মন।

পৃথ্বী অমরের পিঠে হাত দিয়ে কাছে টেনে বলে—চল্‌রে অমর। গ্রামের লোকদের সঙ্গে দেখা করবি না?

—কোথায়?

—করিমবক্স যে বলে গেল, শুনলি না? বড় আস্তে বলেছিল। ওই পাহাড়ে—ঝরণার ধারে। হ্যাঁ করিমবক্স বলল, ওখানে সবাই আছে—রুক্মিণী আছে—মা আছে। মোঘলদের হাত থেকে রক্ষা করে সবাইকে ওখানে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে।

অমর সিং-এর মনে দ্বিধা—সত্যি আছে পৃথ্বী?

—হ্যাঁ রে। করিমবক্স কখনো মিথ্যা বলেনি। ও বড় উঁচু দরের মানুষ ছিল। তুই ওখানে গেলেই বুঝতে পারবি।

অমর সিং-এর কেমন যেন ভীষণ কষ্ট হতে থাকে। সে করিমবক্সের মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ বন্ধ করে ফেলে। ধীরে ধীরে পৃথ্বীকে অনুসরণ করে সে।

প্রভাতের প্রথম রশ্মি তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে আর একটি দিবসের সূচনা হল।

—